# মধুমল্লী

Made with 💖 by টেলি বই 🇮🇳

✅ t.me/bongboi

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ এখানে।

😺 Generated from WikiSource

1. পাতার শিরোনাম
2. মধুমল্লী
3. মা
4. স্বর্গচ্যুত
5. প্রতিশোধ
6. অযাচিত
7. লঘুক্রিয়া
8. গৃহ
9. সম্পর্কে

1. মধুমল্লী
2. সম্পর্কে

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার চতুর্বিংশ গ্রন্থ

# মধুমল্লী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

মাঘ, ১৩২৪

PUBLISHED BY
**GURUDAS CHATTERJEA**
MESSRS. CURUDAS CHATTERJEA & SONS
201, Cornwallis street. Calcutta.

PRINTED BY
**RADHASYAM DAS**
AT THE VICTORIA PRESS
2 Goabagan Street, Calcutta

---

**পরিচ্ছেদসমূহ** (মূল গ্রন্থে নেই)

# সূচীপত্র

মা
স্বর্গচ্যুত
প্রতিশোধ
অযাচিত
লঘুক্রিয়া
গৃহ

# মা

## ১

মিসেস্ ম্যাকোহন এই একমাত্র সন্তানটিকে জন্ম দিয়া যখনই রোগশয্যা গ্রহণ করিলেন, তখন হইতে তাঁহার পিতৃস্নেহবঞ্চিত শিশুটির ভবিষ্যৎ চিন্তায় তাঁহার দুশ্চিন্তাপীড়িত ও ভবনার ঘনজালে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

গুলজান শিশুর ধাত্রী। সে তাহার উকি-রঞ্জিত শ্যামল অনাবৃত বাহুর উপরে তাঁহার শুভ্র মল্লিকা ফুলের মত সুন্দর শিশুটিকে দোলাইয়া ঘুমপাড়ানি ছড়া বলিতে বলিতে সম্মুখের বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল।

"না রাজা কা পলটন না রাজাকা ঘোড়া,—মুলুকমে বাবুয়াকা কোই নেই জোড়া। আগে যায় বোসনাইয়া, পিছে যায় হাতী, মেরি গদিপর চলে বাবু, মাথে লাল ছাতি।"

মিসেস্ ম্যাকোহন জরতপ্ত ললাটে উত্তপ্ত হস্ত ঘর্ষণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কত সাধের ধন তাঁহার—তিনি তাহাকে একটি দিনের জন্যও অমনি করিয়া কোলে লইয়া আদর করিতে পারিলেন না। এ দুঃখ মরিলেও যাইবে না।

শিশু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, গুলজান তাহাকে দোলার বিছানায় শোয়াইয়া সাবধানে নেটের ছোট মশারিটি টানিয়া দিয়া রোগীর গৃহে প্রবেশ করিল।

মিসেস ম্যাকোহন তাঁহার বিবাহিত তিনটি বৎসর এই বিদেশী সঙ্গিনী গুলজানের সেবা, যত্ন ও আন্তরিক হৃদ্যতায় তাহার সহিত প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া তাহাকে যেন তাঁহার এ সংসারের একমাত্র সহায়রূপেই দেখিতেছিলেন। রোগ যতই বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতেছিল বিদায়ের কাল ততই নিকটতর হইতেছে। বুঝিতে পারিয়া স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা দুর্ভাগিনী তাঁহার হতভাগ্য সন্তানের জন্য ইহাকেই তত নির্ভর করিরা ধরিতেছিলেন। ছেলেটি যেন গুলজানের প্রাণ। তাহারই বয়সী তাহার নিজের ছেলে ইয়াসিনের চেয়েও সে যেন তাহাকেই অধিকতর ভালবাসে।

গুলজান্ ভূমে বসিয়া তাহার উত্তপ্ত ললার্টে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল; বিষন্ন চক্ষু তাঁহার জ্যোতিহীন উৎসুক নেত্রের সহিত মিলিত করিয়া কহিল "মেমসাহেব!"

“প্রতিজ্ঞা করো গুলজান্ যে আমি ম’রে গেলে তুমি আমার যাদুকে, আমার জেসুনকে ছেড়ে যাবে না? যতদিন বেঁচে থাক্বে তাকে ইয়াসিনের মতন ভাল বাসবে?” দুর্ব্বল হস্ত গুলজানের স্থূল বাহুর উপরে স্থাপন করিয়া স্নেহ-কাতর জননী ধাত্রীর মুখের দিকে ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া এই কথা বললেন। যেন এই অনুরোধটি রক্ষিত হইলে তিনি যতটুকু সম্ভব শান্তভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিতে পারেন। গুলজান্ তাহার ‘ছোট বাবা’কে তাহার ইয়াসিনের মত ভালবাসা দিতে হৃদয়ের সঙ্গেই প্রস্তুত আছে, তাহার জন্য তাহাকে আর নূতন করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে না! কিছু না ভাবিয়া না চিন্তিয়া কাতর চিত্তে দৃঢ়কণ্ঠে গুলজান্ বলি গেল, “আল্লার নামে শপথ, আমার প্রাণ থাক্তে আমি আপনার ছেলেকে ছেড়ে যাব না। নিজের ছেলের চেয়েও বেশী যত্নে তাকে পালন কর্ব্ব।”

মিসেস ম্যাকোহনের নেত্রজ্যোতি প্রদীপের শেষ রশ্মিটুকুর মত পরম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

## ২

মেম সাহেবের মৃত্যুরপর কাপ্তেন সাহেব গুলজানকে ডাকাইয়া বলিলেন “তুমি ছেলেটাকে বড়ই ভালবাসো দেখতে পাই, তা ওটাকে আমি তোমাকেই দিলাম। আজ থেকে দশ টাকা ক’রে তুমি বেশি পাবে, ওর সব ভার তোমার। ওর সম্বন্ধে তুমি আমায় কোন রকম বিরক্ত করো না—ও কি! কেঁদে যে অস্থির হ’লে! যাও যাও, আমি কান্নাকাটি দেখতে পারিনে —যাও”।

কে জানে কেন ছেলেটার জন্মদিন হইতেই কাপ্তেন সাহেবের তাহার প্রতি কেমন একটা অহেতুকী বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। একটা রাস্তার কুড়নো ছেলের উপর লোকের যেটুকু মায়া জন্মায় নিজের সন্তানের উপর সেটুকুও মমতা ছিল না। পত্নীর প্রতি ভালবাসার অভাবই বোধ হয় এ ভাবের মূলগত কারণ।

গুলজান্ বেতন বৃদ্ধির জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করিল না। তাহার বাছাকে সে যে নিজের কাছে পাইয়াছে, ইহাই তাহার যথেষ্ট পুরস্কার।

বৎসর ঘুরিয়া গেল। জেসুন ও ইয়াসিন্ দুইটি বিভিন্ন জাতীয় শিশু একখানি স্নেহতপ্ত অঙ্ক জুড়িয়া এক ঙ্গেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। একটি সরল শাখা দুইটি কোমল লতাকে যেমন স্নেহে বক্ষে ধরিয়া থাকে, গুলজানের চিত্তও সেইরূপ তাহার দেহসম্ভূত ও প্রতিপালিত শিশু দুটির মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য বোধ করিত না।

মেজর লরির স্ত্রীর সহিত ছেলে দুটিকে লইয়া গুলজানকে কাপ্তেন সাহেব পাহাড়ে পাঠাইলেন।

পাহাড় হইতে ফিরিবার দিন মিসেস লরি তাহাকে তাহার নূতন প্রভু-পত্নীর সংবাদ জানাইয়া কহিলেন, "কাপ্তেন সাহেব তোমায় পূর্ব্বে জানাতে নিষেধ করে ছিলেন তাই এতদিন বলিনি।"

গুলজানের বর্ণ সাধারণ নিম্নশ্রেণীর ভারতীয় স্ত্রীলোকের মত কালো ছিল না। তাহার শ্যামবর্ণ মুখ সহসা পাংশু হইয়া গেল, গৃহে বিমাতা আসিয়াছে! যদি সে বাছাকে তাহার কোল হইতে ছিনাইয়া লয়?

ট্রেণ হতে নামিবার সময় তাহার পা কাঁপিতেছিল, শিশুকে সে দৃঢ় হস্তে চাপিয়া ধরিয়া অনিচ্ছুক ভাবেই নামিল।

ষ্টেশনে প্রভু বা প্রভুপত্নীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল না, বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলে বারান্দায় সে কাপ্তেন সাহেবের সহিত তাঁহার নূতন স্ত্রীকে দেখিল। নূতন গৃহিণী সুন্দরী ও সুস্বাস্থ্যসম্পন্না। প্রথম দর্শনেই তাঁহার বেশভূষা ও ধরণধারণে গুলজানের চিত্ত তাহার প্রতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। হায়! তাহার মেম সাহেব সেই নম্রশান্তকরুণহৃদয়া নারী, তিনি কখনও এমন দামী পোষাক এমন উজ্জ্বল হীরার আংটি পরিতে পান নাই। নূতন মিসেস ম্যাকোহন ঈষৎ হাসিয়া শিশুর দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। গুলজানের বুকটা অমনি একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল! শিশু কিন্তু বিমাতার কোলে গেল না, সে দুই হাতে ধাত্রীর কুত্তাটা চাপিয়া ধরিল। কাপ্তেন সাহেব স্ত্রীর হাত ধরিয়া বললেন,—

"কোনও দরকার নেই ক্লেরা! ওটাকে আমি আয়ার হাতে দিয়েছি। ছেলের হাঙ্গাম তোমায় বইতে হবে না, চলো আমরা বেড়িয়ে আসি।"

তাহার বুকের দুলালকে পাছে কাড়িয়া লয় এই ভয়ে গুলজানের নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—মনিবের কথা শুনিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। শিশুকে সে চুম্বনের পর চুম্বন করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিল।

কিন্তু এ আনন্দ স্থায়ী হইল না। গুলজান শীঘ্রই বুঝিতে পারিল পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত তাহার অধিকার এখানে প্রতি মুহূর্ত্তেই অস্থায়ী হইয়া উঠিতেছে। নূতন গৃহিণী তাহাকে দেখিতে পারেন না।

সপত্নীসন্তান সাধারণতঃ বিমাতার স্নেহভাজন হইতে পারে না। বিশের্ষ আবার যেখানে স্বয়ং শিশুর পিতাই তাহার প্রতি স্নেহলেশহীন! জেসুন্ তাহার

সৌখীন বিমাতার চক্ষুশূল হইতেছিল।

একদিন গুলজান্ নিজের ঘর হইতে উচ্চ ক্রন্দনের শব্দ পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, মিসেস্ ম্যাকোহন তাঁহার মেহগ্নি ব্রূস দিয়া শিশুকে প্রহার করিতেছেন। ক্রোধে তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। জ্ঞানশূন্য হইয়া সে প্রভুপত্নীর হস্ত হইতে ব্রূসখানি টানিয়া লইয়া সবেগে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া তীব্র ভর্ৎসনা সূচক স্বরে উচ্চারণ করিল—“মেম সাহেব!”

তারপর আহতপৃষ্ঠ রোদনকম্পিত শিশুকে কোলে উঠাইয়া লইয়া দ্রুতপদে সে ঘর হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। মিসেস্ ম্যাকোহন গম্ভীর স্বরে কহিলেন “পাজি ছেলেটাকে তুমি যে রকম নষ্ট ক’র্‌চ তাতে শীঘ্রই সে ডাকাতের দলে ঢুকবে দেখচি। আর না!—আমাকে শোধরাবার ব্যবস্থা ক’রতে হবে।”

গুলজান্ সব কথা দাঁড়াইয়! না শুনিয়াই চলিয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনের ভিতরে নিজের ব্যবহারের ফল, আসন্ন বিপদের একটা ছায়া উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল! শিশুকে পুরাতন ভৃত্য ফৈদুর কাছে রাখিয়া একটু মিছরি হাতে দিয়া সে সশঙ্কচিত্তে প্রভুপত্নীর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া চোখের জলে ভাসিয়া বলিল, “মেম সাহেব! নিজের ব্যবহারের জন্য আমি নিতান্ত দুঃখিত হচ্চি, দয়া ক’রে এবারকার মত আমায় মাপ করুন, আর কখনও আমি এ রকম ক’রবো না। ছেলেটা আমার প্রাণ, তাই হঠাৎ বড় রাগ হয়ে গেছলো! আমরা মুখ্য ছোট লোক, আমাদের কথা কি ধরতে হয়?”

মিসেস্ ম্যাকোহন হিন্দি ভাষা ভাল বুঝতেন না, তথাপি যেটুকু বুঝলেন তাহাতে তাঁহার সংকল্প শিথিল হইল না। স্থির কণ্ঠে কহিলেন “তোমার মাহিনা বুঝিয়ে দেওয়া হচ্চে, তুমি এখনি যাও, ছেলে তোমার নয়, আমি ওকে আজ থেকে সোজা করবার ব্যবস্থা ক’রচি।”

গুলজান্ মুহূর্ত্তে চারিদিক অন্ধকার দেখিল। আর্ত্তভাবে সে প্রভুপত্নীর পদতলে বসিয়া দুই হাত যুক্ত করিয়া কাঁদিয়া কহিল “মেম সাহেব! আমায় তাড়িয়ে দিবেন না। মৃত মেম সাহেবের কাছে আমি সত্য করেছি কখনও তাঁর ছেলেকে ছেড়ে যাব না। হয় দয়া করে আমাকে রাখুন, না হয় আমার বাচ্চাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে দিন।”

“এ মাগীর তো স্পর্ধাও কম না!” ঘৃণার সহিত গৃহিণী হাসিয়া ফেলিলেন। কাপ্তেন সাহেব গুলজানের সজল গম্ভীর কণ্ঠ শুনিয়া গৃহের মধ্যে উকি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ‘ব্যাপার কি ক্লেরা?”

ক্লেরা কহিল "আমি ওকে মাইনে চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে বলচি, কিন্তু উনি কিছুতেই যাবেন না।"

কাপ্তেন সাহেব ভ্রূভঙ্গী করিয়া দ্বারের উপরে মুষ্ট্যাঘাত ও ভূমে পদাঘাত করিয়া কহিয়া উঠিলেন "তুমি যখন যেতে বলছো তখন নিশ্চয়ই ওকে এক্ষণি যেতে হবে, যাবে না কি!"

মুহূর্ত্তে গুলজানের অশ্রু শুকাইয়া গিয়া দুই চক্ষু আগুনের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্থির কণ্ঠে কহিল,—

"হাঁ সাহেব, আমি যাচ্ছি!" তার পর সে দৃঢ় পদক্ষেপে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

শিশু তখনও অনুচ্চ স্বরে কাঁদিতেছিল, পৃষ্ঠের কোমল চামড়া রাঙা হইয়া বহিয়াছে, মিছরি সে স্পর্শও করে নাই! ফৈদু শিশুকে প্রত্যার্পণ করিবার সময় ধাত্রীর মুখের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া রহিল।

কাপ্তেন সাহেব অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার নূতন সঙ্গিনীর সহিত ক্লাবে চলিয়া গেলেন। চার ঘণ্টার পূর্ব্বে তাঁহারা ঘরে ফিরবেন না। গুলজান মনিবপুত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া নিজের ঘরে আসিল। একবার সে শিশুকে ভূমে নামাইয়া নিজের ছোট সিন্ধুকটি খুলিয়া তাহার সঞ্চিত টাকা পয়সাগুলি দড়ির গেঁজের মধ্যে পূরিয়া কোমরের ঘুন্সিতে বাঁধিয়া লইল, তারপর দুটি শিশুকে দুই কোলে লইয়া ধীর পদক্ষেপে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। উর্দ্ধে চাহিয়া মনে মনে কহিল "মেম সাহেব! তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি—সেই সত্য রাখার জন্য আজ গুলজান এই পাপ করতে বাধ্য হলো। তুমি স্বর্গে থেকে সাহায্য কর। আমি বেঁচে থাকতে তোমার ছেলেকে নিষ্ঠুর বিমাতার হাতে দিতে পারবো না।"

শিশুর সহিত গুলজানের অদৃশ্য হওয়ার সংবাদ প্রচার হইলে কাপ্তেন সাহেব কোন রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়াই স্ত্রীকে কহিলেন "আঃ যেতে দাও না ক্লেরা, কি হবে সেটাকে নিয়ে? তোমার আমার চেয়ে সে স্ত্রীলোকটা বরং ছেলেটাকে পেয়ে ঢের বেশি খুসী থাকবে।"

কথাটা সত্য। তথাপি লোকে কি বলবে? এই বলিয়া মিসেস্ ম্যাকোহনের বিবেক এই নিষ্ঠুর যুক্তির বিপক্ষে জাগরিত হইয়া উঠিল।

একটা আয়া দুই কাঁধে দুইটা সমবয়স্ক। শিশু—তাহার একটি সাদা ইউরোপীয় এবং অপরটি পশ্চিমী মুসলমান শিশু—লইয়া পলাতক, ইহাদের

ধরিয়া দিতে পারিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে, এইরূপ একটা বিজ্ঞাপন কাগজে দেওয়া হইল। কিন্তু চেষ্টা সফল হইল না। গৌরবর্ণ, শ্যামবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ একটি দুটি তিনটি ছেলে কোলে কাঁখে করা স্ত্রীলোক পথে ঘাটে অনেক দেখা গেল। শুভ্র শিশু সংযুক্ত নারী কোথাও মিলিল না।

## ৩

গুলজান্ গোরখপুর হইতে পলাইয়া হাঁটা পথে পশ্চিমবঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া পদ্মাপারে নিজের দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতার কাছে আশ্রয় লওয়ার পর ষোল বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ইয়াসিন এখন সুশ্রী, সবল যুবাপুরুষ। এখন সে মাতুলের গাড়িঘোড়ার ব্যবসায়ের অংশীদার। গুলজান তাহার জন্য কঠিনতর পরিশ্রম করিতে এখনও শ্রান্তি বোধ করিত না। সে মায়ের চেয়ে দাসীর মতই তাহার সেবা করিত। ছেলেও মা ভিন্ন কাহাকেও চিনে না, এখন সে মায়ের কোলের শিশু, আদরের দুলাল!

শরীরের শক্তিতে মনের তেজে ইয়াসিন নিজের কার্য্যে বেশ একটু উন্নতি করিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কি ছিল তাহা নিজেই জানিত না, কিন্তু এইটুকু সে লক্ষ্য করিয়াছে যে, তাঁহার মুখ চাহিয়া দেখিলেই তাহার ইংরাজ আরোহীর চোখে একটা বিস্ময়পূর্ণ স্নেহ-করুণার ভাব ব্যক্ত হইয়া উঠিত এবং সে ভাড়াটা বেশ ভাল রকমই লাভ করিয়া আসিত। আর ইহাও এক বিচিত্র ব্যাপার যে, ঐ সকল সুপরিচ্ছদধারী সুন্দরমূর্ত্তি নরনারীদের দেখিলে তাহারও প্রাণের মধ্যে কি যেন একটা আকুলতা উদ্দাম হইয়া উঠিতে চাহিত; তাহাদের সান্নিধ্য সে চুম্বক পাথরের আকর্ষণের মত কিছুতেই যেন ছড়াইয়া লইতে পারত না।

একদিন গুলজান্ দেখিল, ইয়াসিন্ নিজের অঙ্গ হইতে দড়ি বাঁধা মিরজাই খুলিয়া রাখিয়া বিস্ময় ব্যাকুলনেত্রে নিজের অঙ্গের প্রতি চাহিয়া আছে। গুলজানকে দেখিয়া সে ইঙ্গিতে কাছে আসিতে বলিল, কম্পিতপদে গুলজান্ নিকটে আসিলে, সহসা যুবক জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল “মা এর মানে কি আমায় ব’লো, কেন আমার গা এত সাদা? আমি শুনেছি—আজই শুনেছি—লোকে বলে—ওঃ আমি বলতে পারিনে—সে কি ভয়ানক কথা; —বলে আমি তোমার জারজ সন্তান। আমি সাহেবের ছেলে।”

সর্পাহতের মত গুলজান আড়ষ্ট হইয়া রহিল, তাহার মুখে বাক্য সরিল না। সুদীর্ঘ দিনে যে স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল, সহসা তাহা মেঘোদ্ভিন্ন সূর্য্যকিরণের মত ফুটিয়া উঠিল। নিষ্ঠুর সন্দেহে ইয়াসিন্ উন্মাদের মত লাফাইয়া মায়ের হাত চাপিয়া ধরিল।

"সত্যি, তবে সত্যি! আমি তবে সাহেবের ছেলে?"

যন্ত্র চালিতের মত গুলজান উত্তর করিল "হ্যাঁ"।

"রাক্ষসি!" ইয়াসিন্ বাঘের মত গর্জ্জিয়া উঠিল "কেন আমায় নুন খাইয়ে মারিসনি?"

গুলজানের সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। আত্মপরিচয় জানিয়া লইয়াছে, এইখান হইতেই সে তবে নিজের জন্য পথ নির্ব্বাচন করিয়া লউক। সে যে কোন্ পথ বাছিয় লইবে, ইহাও সে জানিত। কম্পিতস্বরে কহিল "বাছা, আমার সব কথা না শুনে তুমি রাগ করো না, আগে সবটা স্থির হয়ে শুনে যাও"—এই বলিয়া সে সমস্ত কাহিনীটা এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল। সে বলিল "তুমি সাহেবের ছেলে এ কথা সত্য, কিন্তু আমার গর্ভে তোমার জন্ম হয়নি। আমার গর্ভজাত সন্তান ইয়াসিনের ষোল বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হয়েছে; তুমি মেম সাহেবের পুত্ত্র। তোমার বাপ তোমার মাকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারতেন না, তোমার প্রতিও তাঁর এতটুকু স্নেহ ছিল না, তোমার মা মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বক্ষণেই আমাকে সত্য করিয়ে নিয়েছিলেন যে, জীবন থাকতে আমি তোমায় ছেড়ে যাব না।"

তারপর সে অত্যন্ত মৃদু ও হৃদয়ভেদী স্বরে তাহাদের পলায়নের কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল, শুনিয়া ইয়াসিন্ কিছুই বলিল না। সে যেন অকস্মাৎ একটা প্রস্তর মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

গুলজান্ কহিতে লাগিল—"শুনলুম আমাদের ধরবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। ধরা পড়লে যে কি হবে আমার জানাই ছিল, মাথায় বজ্রাঘাত পড়ল। গোরখপুরের শালের জঙ্গলে একজন সন্ন্যাসী থাকতেন, তাঁহারই কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লুম। তিনি বল্লেন,—দুজন সঙ্গে থাকলে ধরা পড়বে, একজনকে ত্যাগ করে যাও। পরামর্শ উচিত মতই, কিন্তু করা বড় কঠিন। কাকে ত্যাগ করব? কোথায় রাখব? বিশ্বাস করবার কে আছে যে পুরস্কারের লোভে আমাদের ধরিয়ে দেবে না? আমি তোমার মাকে স্মরণ করলুম। বল্লুম—"আমার সমস্যা দূর করে দাও, নিজের ছেলের মায়ায় আমি যেন তোমার ছেলেকে ফেলে না যাই। তার বিমাতা বড়ই নিষ্ঠুর!" বোধ হয় তোমার মা সে কথা স্বর্গে থেকে শুনেও ছিলেন। সেই রাত্রেই ফকিরের আশ্রমে আমার নিজের ছেলেকে ফেলে তোমাকে তার

কাপড় পরিয়ে ও এক রকম রং মাখিয়ে নিয়ে আবার পথে বার হলুম। ইয়াসিনের ক্ষীণ ক্রন্দন ক্রোশের পর ক্রোশ ধরে আমার কানে বাজতে লাগল, জ্বরে সে যেন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সত্য যে সবার চেয়ে বড়! ঈশ্বর যে সকলেরই উপরে বাপ! আমি যে তোমার মাকে কথা দিয়েছিলুম! এখানে আসবার পর চিঠি লিখে খপর নিয়েছিলুম, সেই রাত্রেই সে মারা গ্যাছে। আমি মনে করি তুমিই আমার ইয়াসিন্।

এখন তুমি বড় হ'য়েছ, তোমার পথ তুমি ঠিক করে নাও,—তবে আমার প্রতি এইটুকু দয়া করো, যেখানে থাকো আমাকে তোমার বাড়ির দাসী করে রেখো।"

ইয়াসিন্ অনেকক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে একদিকে চাহিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ সে স্বপ্নমুগ্ধের মত এক পা এক পা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। একটিও কথা কহিল না। গুলজান্ও তাহাতে তাহাকে বাধা দিল না। নিজে সে নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল।

৪

সমস্ত দিন পথে পথে ঘুরিয়া রাত্রে আবার ইয়াসিন্ গৃহে ফিরিয়া আসিল। গুলজান্ও জানিত যে, সে আর একবার আসিবে। সে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। ইংরাজটোলায় আজ ইয়াসিন্ অনেক ঘণ্টা কাটাইয়াছে। খোলা জানালার নেটের পর্দ্দা বাতাসে কাঁপিয়া সরিয়া যাইতেছিল; ভিতরে শুভ্র আস্তরণবিস্তৃত টেবিল ঘেরিয়া চৌকিগুলি সাজান, হাস্যকৌতুকোচ্ছ্বসিত সুপরিচ্ছদধারীগণ সেই চৌকি দখল করিয়া রহিয়াছে। রৌপ্য চামচের টুন্ টান্ শব্দে এবং খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের সুপ্রচুর সদ্‌গন্ধে বায়ু পূর্ণ করিয়া মধ্যাহ্নভোজন চলিতেছে। সন্ধ্যায় কোন গৃহে মধুরস্বরে পিয়ানো বাজিয়া উঠিল, কোনও উদ্যানপথে শ্রান্ত প্রণয়ী দুইখানি ব্যগ্রহস্তে বাঁধা পড়িলেন। কোথাও বা ঠেলা গাড়িতে শিশুকে বসাইয়া পার্শ্বে জনকজননী স্নেহহাস্যে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। ইয়াসিনের প্রাণের ভিতরে ব্যাকুলতা অসম্বরণীয় হইয়া উঠতে লাগিল। সে এই দীনহীন অশ্বপালক—ছিটের মেরজাই গায়ে নাগারা-জুতা-পরা নগণ্য ঘৃণিত ইয়াসিন্; সে কিন্তু উহাদেরই মত ইংরেজসন্তান, ইহারা তাহার আপনার লোক! সেও এইরূপ সুখস্বাচ্ছন্দ্য এই মূহুর্ত্ত হইতেই ক্রয় করিতে সক্ষম। শুধু এক বার ছুটিয়া গিয়া ওই যে—ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলার আদালত হইতে শতপ্রাণীর মুণ্ডদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া টম্‌টম চড়িয়া ফিরিতেছেন, তাঁহাকে সব কথা বলিবার মাত্র অপেক্ষা।

কিন্তু— না না একি সে ভাবিতেছে! সে পাগল হইয়া যাইবে না কি? সে তো গুলজানের কথা ভাবিতেছে না? ম্যাজিষ্ট্রেট যখন তাহার কাহিনীর সত্যাসত্য বিচার করিবার জন্য তাহাকে ডাকাইয়া আনিবেন? এবং তারপর, পরের ছেলে— ইংরাজের সন্তানকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে চুরি করিয়া আনার জন্য তাহাকে যখন চালান দিবেন? উঃ না! ঈশ্বর তাহাকে এই দুরন্ত লোভ হইতে রক্ষা করুন।

গভীর অন্ধকারে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছিল। দরিদ্র পল্লীতে কচিৎ কোন ক্ষুদ্র জানালার ভগ্ন কবাটের ফাঁক দিয়া কেরোসিনের প্রচুর ধূমের সহিত ক্ষীণালোকরেখা প্রকাশিত হইতেছে। ইহার ভিতরে সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। তীব্রস্বরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতেছিল। অস্ফুট নক্ষত্রালোকে গুলজান্ দাওয়ায় চারপায়ার উপরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ইয়াসিন্ আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। সে বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছে, গুলজান কে ফাঁসাইয়া সে নিজেকে কাপ্তেন ম্যাকোহনের পুত্ত্র বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবে না— কিছুতেই না! পথে দুইজন ইংরাজের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহারা চলিতে চলিতে হঠাৎ তাহার দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেও কৌতুহলী হইয়া চলিয়া না গিয়া দাঁড়াইয়া দুই চোখ তুলিয়া তাহাদের চোখের দিকে চাহিয়া দেখিল। একজন ইংরাজ অপরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “বাই জোভ! নিশ্চই এ ছেলেটি একজন ছদ্মবেশী ইউরোপিয়ান্!” বাঘের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া সে তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়িল, গর্জ্জন স্বরে কহিয়া উঠিল “চুপ রও!”

ইংরাজ দুজন উচ্চহাস্য করিয়া চলিয়া গেল।

অন্ধকারে কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছিল না। রাত্রের বাতাস কেবলি বিলাপের নিঃশ্বাসের মত ঘরে ও বাহিরে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। দু একটা নিশাচর প্রাণীর ক্ষীণ কণ্ঠশব্দ আর্ত্তহৃদয়ের যন্ত্রণাধ্বনির মত শূন্যে চকিত হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে। মৃদুস্বরে গুলজান্ ডাকিল—“ইয়াসিন্!—জেসুন বাবা!”

জেসুন তাহার কর উপর মাথা রাখিয়া বলিল—“মা!”

---

# স্বর্গচ্যুত

## ১

সে প্রতিদিন বিকেলবেলা একটা পাহাড়ের তলায় সমতল ভূমিতে ঝাউগাছের তলাটীতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌ত। মুক্ত বাতাস তার চুলগুলি নিয়ে খেলা কর্‌তো। কখন বা একটী দোলা দিয়ে পালিয়ে যেত। আর গোছা গোছে সরু চুলগুলি সরে এসে তার ছোট ফুট্‌ফুটে কচি মুখখানি ঢেকে ফেল্‌ত। বালিকাকে কিন্তু কখনও তাদের বাধা দিতে দেখিনি, তেমনি ভাবে তারা তার মুখে বুকে ছড়িয়ে পড়ে খেলা কর্‌তো। তার পায়ের কাছে সেই গাছটী রোজই কতকগুলি ঝাউ ফল ও পাতার উপহার সাজিয়ে ধ'রত। রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে পথিকেরা একটী বার তার দিকে চেয়ে থম্‌কে না দাঁড়িয়ে, একবার তার মুখখানি অতৃপ্ত দৃষ্টিতে না চেয়ে দেখে, কখনও চলে যেতে পার্‌তো না।

সে কিন্তু বড় একটা কাকেও লক্ষ্য কর্‌তো না। হয়ত একটা ঝাউ পাতার ঝাড়, না হয় কোন একটী ফুলের গুচ্ছ হাতে করে সুমুখের রাস্তা পানে কালো চোক্ দুটী স্থির রেখে দাড়িয়ে থাক ত। দেখে আচম্‌কা মনে হতো কে যেন লোকের তারিফ্ নেবার জন্য এইখানে তার বড় যত্নে আঁকা ছবিখানি রেখে আড়ালে কাণ খাড়া করে আছে। সেই ছোট মুখখানি আমায় অকৃষ্ট করে ফেলেছিল। কত দিন মনে করেছি কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, রোজই সে এই একটা জায়গায় তার এই বয়সের হাসিখুসী খেলাধুলো ফেলে চুপটী করে দাঁড়িয়ে থাকে কেন? কিন্তু তার কি রকম একটী মৌন গাম্ভীর্য্য তাকে যেন সবার মধ্য থেকে একটু খানি আড়াল করে রেখেছিল, সেই টুকুই আমাকে বাধা দিতে লাগ্‌ল। মনে হ'ত, যদি এই কথার শেষেই তার ঐ আকাশের মত স্বচ্ছ সুনীল চোখ দুটা জলে ভরে ওঠে? কি দিয়ে তবে তাকে থামাব। দু এক পা অগ্রসর হয়েও তাই সঙ্কোচে মরে গিয়ে ফিরে এসেছি। কিন্তু আমার মনটি যে ক্রমেই সেই অজ্ঞাত মেয়েটির দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, সেটুকু নিজে নিজেই বেশ বুঝতে পার্‌ছিলুম।

একদিন—সেদিন শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে ভর করে পাতলা কুয়াশার স্তর ক্রমেই জমাট বাঁধা মেঘের গায়ে মিশে গিয়ে দুর্য্যোগের সূচনা করে উঠ্‌লো। পাখীরা সব যে যার বাসায় স্থির হয়ে বসে জিরোচ্ছে, সেদিন রাস্তাতেও দু একটা হতভাগ্য ভিন্ন কেউ আর বার হয়নি। এমন ক্লান্তিজনক নিরানন্দ দিনে আমায় গুরুতর প্রয়োজনে একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'র্‌বার জন্য বাড়ীর সেই গরম ঘরখানি ছেড়ে এই ঠাণ্ডা হাওয়ার পথে বেরোতে হলো। সইস বাড়ী নেই, তাছাড়া

ঘোড়াটা— আহা নিরীহ জীব! আমার জন্য সে বেচারী কেন তার তপ্ত কম্বলখানির আলিঙ্গনচ্যুত হ'য়ে এমন আনন্দ-ভোগটুকু হারায়।

মধ্যাহ্নে একেতো গ্রাম্যপথ জনশূন্যই পড়ে থাকে, তাতে আজ দিনটাও সুবিধাজনক নয়, কাজেই কেউ কোথাও নেই। মনে স্ফুর্ত্তি আনবার জন্য শিষ দিতে দিতে একটি পুরনো গানের একটা চরণ গাইছিলুম। হঠাৎ সেই গাছতলাটীতে চোখ পড়ে গেল, কি আশ্চর্য্য মেয়েটী আজও তো দাঁড়িয়ে আছে! আহা! বেচারীর ঠোট দুখানি শীতে নীল হয়ে গেছে, ঠাণ্ডা বাতাসে অল্প পোষাকে তাকে কাঁপিয়ে তুলেছিল, তবু সেই রকম মুখের ভাব। যেন কোন কিছুতেই সে ভাবটুকুর বদল হতে জানে না!

দ্রুতপদে কাছে গেলুম, কৌতূহল আর চাপা গেল না। আমাকে দেখে তার বড় বড় চোখ দুটীতে একটু খানি যেন বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠ্‌ল; সে বাঁদিকে মুখখানি একটু ফিরিয়ে অপাঙ্গে আমার দিকে একটীবার চেয়ে দেখ্‌লে। কাছে গিয়ে তার একখানি হাত ধরে আদর করে জিজ্ঞেস ক'র্‌লুম "এত শীতে আজও তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন বাছা?"

মেয়েটী আস্তে আস্তে চোখ দুটী আমার মুখ থেকে নামিয়ে নিলে, হাতখানি কিন্তু সরিয়ে নিলে না, একটুখানি চুপ করে থেকে তারপর আবার আমার পানে চোখ তুলে চেয়ে অত্যন্ত মিষ্টস্বরে উত্তর দিল "আমার ভাই ইস্কুল থেকে আসবে বলে আমি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকি। আজ কিনা শনিবার, সেইজন্য আজ এক্ষুনি থেকে এসেছিলুম।"

কি একটা অনুভূত আনন্দে আমার সমস্ত শরীরটায় যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো। কি মধুর ভ্রাতৃস্নেহে এই শিশু হৃদয়টুকু পূর্ণ হয়ে আছে। সুন্দর ফুলটি তেমনি কি সুরভিস্নিগ্ধ! জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, তোমার বাড়ী বুঝি কাছেই? তোমার বাড়ীতে আর কে কে আছেন?"

বালিকা তার হাতের ফলের ঝাড়টা একটু খানি নেড়ে চেড়ে আমার পানে তার— আজকের আকাশের মত নয়—কিন্তু অন্যদিন যে রকম রং আকাশে মেঘের সময় দেখা যায় তেমনি রংঙের— চোক দুটি ফেরালে, কি শান্ত সুন্দর সেই দুটী চোখ!

নম্রভাবে ধীর কণ্ঠে বলে, "বাড়ীতে আমার মা আছেন, আর কেউ নেই। ঐ যে আমাদের বাড়ী।"

বালিকার নির্দ্দেশ মতন চেয়ে দেখলুম, নদী তীরের যে ছোট কুটীরগুলি এ যাবৎ লক্ষ্যের বিষয় বলে কখন মনেও করিনি তারি একটি কুটীর সেই চাঁদের মত মেয়েটিকে কোলে নিয়ে পবিত্র হয়ে উঠে এখন আমার দিকে উপহাসের দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌ছে। মনে মনে আশ্চর্য্য বোধ কর্‌লুম, এই মধুময়ী বালিকা দরিদ্র গৃহ উজ্জ্বল করেছে! ভাবলুম, চাঁদের জ্যোৎস্না, সূর্য্যের আলো পানা-পুকুরে কি ভাসে না! কি একটা কথা ব'ল্‌তে যাচ্ছিলুম হঠাৎ মেয়েটির মুখখানি এমনি চক্‌চকে হয়ে উঠ্‌ল যে আমি ভাষা হারিয়ে ফেলে সেই দিকে ফিরে চাইলুম। হঠাৎ একটি খসে-পড়া তারার মতন চঞ্চলগতি বালককে আমাদের অদূরে দেখতে পেয়ে বুঝ্‌তে পার্‌লুম, এইটিই মেয়েটির লক্ষ্যকেন্দ্র, এরি একর্ষণ একে এখানে টেনে রেখেছিল, এই তার ভাই।

## ২

এর পর থেকে আমার সঙ্গে তাদের পরিচয় একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ল। আমার জীবনের এই—কটা মাসই যেন সব চেয়ে স্মরণীয় ও সব চেয়ে বরণীয় হয়ে আমার জীবন-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে জ্বল জ্বল ক'র্‌চে। অল্প বয়সে অল্প কয়টি বৎসরের জন্য আমি আর একবার এই বিশ্বজগতের রহস্যময় আবরণমুক্ত আলোককীর্ণ উজ্জ্বল অংশের পরিচিত হয়েছিলুম বটে; কিন্তু সে আলেয়ার আলো এত শীঘ্র আমার গভীর প্রান্তরের মাঝখানে ফেলে মিলিয়ে গিয়েছিল যে, সে আলোকের জ্যোতি বাস্তবের চেয়ে স্বপ্নের মত অনুভবের জিনিষে দাঁড়িয়েছিল মাত্র, শুধু স্বপ্নে উপভোগ্য বস্তুতে দাহ থাকে না, ঐ বাস্তব বলিয়া বাহ্য শক্তিতে পরিপূর্ণ।

কাঞ্চী অভিরমা পুরাতন ক্ষত্রিয় কুলের এক দরিদ্র নারী; তাঁহার হাসি মুখখানিতে করুণা ফুটাইয়া বিনীত লজ্জায় আমায় পুরাতন চারপায়া খানি এগিয়ে দিতে গিয়ে অনেক সময় ক্ষমা চেয়ে স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, তার একটা পায়া হাল্কা হয়ে পড়েছে, একটু সাবধানে বসা প্রয়োজন। অতি সামান্য যব জনেরার রুটি, একটু খানি নুলিয়া শাক, যৎসামান্য ফলটা মূলটা আমি যখন ছেলেদের সঙ্গে আমোদ করে খেতে বসতুম, তিনি তার অলক্ষিতেও যেন ঈষৎ লাল হয়ে উঠতেন, কিন্তু তাঁর সেই দারিদ্র্য-প্রকাশক আতিথ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছুই কুণ্ঠিত ভাব প্রকাশ কর্‌তেন না। দারিদ্র্যে যে একটা উৎকট লজ্জাও গোপন থাকতে পারে, সেটা যেন এই পরিবারের ধারণায় কোনদিন ধরা দেয় নি। নিঃশঙ্ক গরিমায় আপনাতেই তারা সমুন্নত, কোনখান দিয়ে অপরিতৃপ্তির দীনতা তাদের স্পর্শ ক'র্‌তে পারেনি।

কাঞ্চী—সেই ছোট্ট পরিকন্যাটির মতনই চমৎকার মেয়েটি—তার মার গৃহকর্ম্মেও বড় অল্প সাহায্য কর্‌ত না। নদী থেকে জল এনে সে যখন তার ছোট্ট কচি হাতে স্বল্প বাসন ক'খানি নতমুখে বসে পরিষ্কার করিত, নিকষ কালো চুলের দু-একটি গোছা সে সময় তার পিছন হতে কখন চুপিচুপি এসে জ্যোৎস্না-মাখা মুখখানির দুদিক থেকে উঁকি দিয়ে চেয়ে দেখ্‌ত; নিবিষ্টতার একটি ভাব মসৃণ ললাটখানির উপরে ফুটে উঠে তখন তাকে যেন কর্ম্মের একটি ছোট্ট জীবন্ত ছবির মতন দেখাতে থাক্‌ত। বড় ঘরের হলেও সে আজ নেপালের গরীবের মেয়ে, — গ্রামে অবৈতনিক পাঠশালা নেই। ঘরেই সে মার কাছে, দাদার কাছে পড়া জেনে নেয়। আমি খুব একটি সুযোগ পেলুম। বলে বসলুম, আমি তোমায় রোজ পড়াব।"

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সে এমন করে আমার পানে চেয়ে দেখলে যে, সামান্য কাজের বদলে ততখানি মূল্য আমি সইতে না পেরে হঠাৎ চোক ফিরিয়ে নিলুম।

নেপালী মেয়েরা প্রায় খুব বুদ্ধিমতী হয়। এরও বেশ বুদ্ধি শুদ্ধি, খুব মনোযোগী। যখন সে দাদার জন্য ঝাউতলাটীতে দাঁড়িয়ে থাকে, সেইটি তার পড়া তৈরি করবার একটা সময়। জামার তলায় বইখানি লুকনো থাকে, মধ্যে মধ্যে দেখে নেয়, আর মনে মনে মুখস্থ করে যায়। ভাল ভাল অনেকগুলি কবিতা তার দাদার পাঠ্য পুস্তক থেকেও এমনি করে সে মুখস্থ করেছে, শেখান পাখীর মতন বেশ সুন্দর রকমে সেগুলি আবৃত্তি করতে পারে।

আমার ঘরে কোন কাজ নেই। উদ্ভিদতত্ত্ব সংগ্রহ ও সংকলন করেই দিনগুলোকে এক রকম করে কাটিয়ে দিয়ে কোন রকমে এক বার পার হয়ে যাওয়া; কিন্তু এবার শুষ্ক আগ্রহহীন দিনগুলাকে আমি জয় করেছি। যেখানে কখন জল ছিল না, একদিন সেখানকার মাটিকে বিদীর্ণ করে শীতল জলের নির্ঝর হঠাৎ ছুটে বেরিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা নদীর তীরে আমাদের দেখা হত। ক্ষেতগুলিতে জল দিয়ে, বাগানটীর বেড়া বাঁধায় তাদের সাহায্য করে তাদের সঙ্গে সবুজ ঘাসের উপর বসে পড়ে দেশ বিদেশের নানারকম গল্প ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমার মনে হত, স্বর্গ কোথায়? আমার দেওয়া জলছবির খাতা, কিছু খাবার ও খেলনা হাতে করে তুলে নেবার সময় দুটি শিশুরই আনন্দ-উজ্জ্বল দুখানি মুখে হঠাৎ একটী কুণ্ঠার দ্বিধা এত ধীরে ঈষৎ রক্তিমার সঞ্চার ক'র্‌ত যে, আমি দুঃখিত না হয়ে তাদের নির্লোভ মর্য্যাদাজ্ঞানের পরিচয়ে আনন্দই অনুভব কর্‌তুম। স্বাধীন পার্ব্বত্য প্রদেশীয়ের সন্তানজ্ঞানে তাদেব ছোট বুকদুটিও ভরা। তা থাক, ছোটই তো বড় হয়।

অভিজিৎ বল্‌তো তার বড় যোদ্ধা হবার সাধ। তাদের পিতামহ এবং পিতা নাকি নেপালে যুদ্ধের সময় সম্‌সের জঙ্গের পক্ষে থাকিয়া দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন। তাই দাদার কথা শুনে কাঞ্চীর ফোটা ফুলের মত মুখখানি ভয়ে যেন এতটুকু হয়ে যেত। সে ছোট দুটী হাতে তার গলাটি জড়িয়ে ধরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা করুণ স্বরে আস্তে আস্তে বল্‌ত "না ভাই যুদ্ধ ক'র্‌তে যেও না, যদি তুমিও মরে যাও।"

খুব বড় একজন সাহসী সেনাপতির মতন বালক ঈষৎ অবজ্ঞার হাসি হাসিত "বীরের মৃত্যু কি মরণ রে? বীর মরে অক্ষয়স্বর্গ লাভ করে। বোকা মেয়ে, তাও জানোনা?"

## ৩

সুখের দিন; এ দিন গুলার চেয়ে দ্রুতগামী বিশ্ব সংসারে আর কিছুই আমি খুঁজে পাইনে। এই হৃদয়টাতো শ্মশানের মত ভয়ানক হয়ে গেছলো, আজ আবার হঠাৎ এই শিশুটি তাদের দুঃখনাশী সঙ্গদানে সেইটেকেই যেন বসন্তের চিহ্ন-ভরা মনোরম বাগানে পরিবর্ত্তিত করে ফেলেছিল। কেন্দ্রচ্যুত গ্রহ একটা—যে অনন্ত আকাশের চারিদিকে তার নিজের ব্যর্থতা বুকে করে চারিদিকের আলোর পানে চেয়ে কেবলি লক্ষ্যশূন্য ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ যেন আবার তাকে একটি কেন্দ্রের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বুঝেছিলুম শিশুবুভুক্ষিতের পক্ষে বড় কম পুরস্কার নয়। এমন সময় হঠাৎ একদিন পাহাড় থেকে নেমে কলকাতার আদালতে সাক্ষ্য দিতে যেতে হল। মনের ভিতরে সংসার থেকে বিদায় নিয়েছি অনেক দিন, কিন্তু সংসার তা বল্লেতো বোঝে না, সে আবদারে শিশুর মতন আঁচল নিয়ে টানাটানি ক'রে তার পাওনা আদায় করতে চায়। যাবার সময় অভিজিতের সঙ্গে আর দেখা হ'ল না, তাদের পাঠশালে পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সে ক'দিন ভারী ব্যস্ত। গাড়ীখানাকে এগিয়ে দিয়ে নিজে হেঁটেই বেরিয়ে প'ড়লুম। আহা এমন শান্ত সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা নষ্ট করে ফেলে কর্ক্কশ চক্রধ্বনি তুলে কেন প্রকৃতির নির্ব্বোধ শান্তিতে ব্যাঘাত দেওয়া? এটা শুধু নিষ্ঠুরতা নয়, . অপরাধও!

সেই ঝাউতলায় আমি যে কাঠের ছোট বেঞ্চ খানি রেখেছি, কাঞ্চী তার উপরে বসে আপনার মনে পা দুখানি দোলাতে দোলাতে কি একটা আবৃত্তি কর্‌ছিল। বোধ হয় তার পাঠ্য পুস্তকের সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের বিষয়ক কবিতাটি। কাল আমি তাকে ওইখানটা পড়া দিয়েছিলুম কিনা তাই এইটেই সন্দেহ হলো। ফুর ফুরে একটুখানি হাওয়া ছিল। খুনসুটে ভাইয়ের মতন সে তার সরু সরু চুলের গোছাগুলো নিয়ে ক্রমাগত তার চোখে মুখে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে বড় জ্বালাতন করে তুলেছিল। আমি চুপি চুপি তার পিছন দিক্ থেকে কাছে গিয়ে বড় একটা গোলাপ ফুল তার মাথার উপরে রাখতেই সে এমনি দ্বিধাহীন ভাবে হেসে ফিরে

চাইলে যে, আমি ভিন্ন তার সঙ্গে কোন রকম কৌতুক কর্ব্বার আর কারু যে—অভিজিৎ সিং যখন স্কুলে আছে—সাহস থাকা সম্ভবই নয়, এই ভাবই তাতে প্রকাশ পেলে। হঠাৎ সে মুখ ফেরানয় ফুলটি তার মাথা থেকে ভূঁয়ে পড়ে গেল, আমি হেঁট হয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ধূলো ঝেড়ে তার হাতে দিলুম। আগ্রহ করে সে ফুলটি নিয়ে সেটি আঘ্রাণ করে একটু খানি হেসে বল্লে, "দাদাকে রাত্রিতে অনেকক্ষণ পড়তে হয়, ফুলটী ঘরে থাক্‌লে এর গন্ধে তার অনেকটা ক্লান্তি দূর হ'বে।"

আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হয়ে তার ঈষৎ আনন্দিত মুখখানির দিকে চেয়ে দেখলাম। কতখানি ভালবাসা এদের মনের মধ্যে সকল সময়ে পরস্পরের প্রতি অচঞ্চল ধ্রুব তারকার মত নির্নিমেষে জাগ্রত হয়ে আছে? প্রশংসাপূর্ণ আদরে তাকে চুম্বন করে বল্লেম, "তোমার দাদার জন্য তুমি যত ইচ্ছে আমার বাগান থেকে ফুল কেন নিয়ে এসোনা কাঞ্চী! আমি তো কদিন থাক্বো না, তুমি নিজে গিয়েই অনেক করে ফুল এনো। আমি সইসকে বলে দেব এখন।"

কাঞ্চী আমার কথা শেষ না হতেই চকিত হয়ে আমার পানে চাইলে, "থাক্বেন না, কোথা যাবেন?"

"বাংলায়, আবার শীঘ্র আসবো।"

কিন্তু আমার সান্ত্বনায় কাঞ্চী যেন তেমন খুশী হল না, সে ঈষৎ একটা নিশ্বাস ফেলে হঠাৎ মুখ নীচু করে নিলে, স্পষ্ট দেখতে পেলুম তার স্বচ্ছ চোখ দুটিতে জল টলটলিয়ে এসেছে।

ক'দিন কাজকর্ম্ম ও বন্ধু বান্ধবের আদর আপ্যায়িতের ভেতরও তাদের কথা মন থেকে একবার মিলিয়ে যায়নি। সেই দুফোঁটা অশ্রুজল যেন আমার বুকে সুখের বেদনায় সকল সময়েই নিদাঘের বারিবিন্দুটুকুর মতন টলটল কর্‌ছিল। সেই দুটি অশ্রুবিন্দু, যে জাহ্নবীবারির মতই পবিত্র!

সারাদিন সময় ছিল না, কিন্তু রাত্রে স্তিমিকালোক নির্জ্জন শয়নকক্ষে তপ্ত শয্যার মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেই আমার স্মৃতির বাঁধন খসে পড়তো। মনে হতো আমার বিহনে তাদের না জানি কতই কষ্ট হ'চ্ছে! আহা কচি কচি ফুলের মতন যে দুখানি নরম হাত একটুতেই যেন তাতে রক্ত ফুটে ওঠে। ঘুমিয়ে ও নিস্তার ছিল না, স্বপন দেশের পরীরাণী কাঞ্চীর মুখের মতন মুখোস পরে মাথার শিওর ঘেঁসে নিত্য নিত্যই আনাগোনা আর করে দিয়েছে; আশ্চর্য্য হচ্ছি এইটিতেই তারা অনেক দূরের প্রবাসী, কেমন করে এই শুখ্‌নো প্রাণের দুর্ব্বলতা এরি মধ্যে টের পেয়ে

গেল! এদের চরগুলোতে দেখছি আমাদের কল্‌কাতা সহরের গুপ্তচরের চেয়েও সজাগ থেকে টাট্‌কা খপর সব রপ্তানি করে থাকে।

অনেকদিন প্রকৃতি দেবীর বিশ্রামকুঞ্জ নেপালের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করে, এখন এই সহরের লোকগুলোকে তাদের অফিসের কাপড় পরা ধূলা, ধোঁয়া ও জনতা ভেদ করে কর্ম্ম ত্রস্ত ব্যস্তভাবে যাওয়া আসা কর্‌তে দেখতুম, আর তাদের জন্য মনের ভেতরে করুনার রাশি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে থাক্‌ত। মুখে সর্ব্বদা সতর্ক উত্তেজনা, গতি যেন ঝড়ের হাওয়ার মতন চঞ্চল, বিশ্রাম বলে একটা জিনিষের সঙ্গে এর যেন পরিচিত হবার সুযোগই পায়নি। হয়ত এরা কল্পনা কর্‌তে পারে না যে, এই সংঘর্ষময় বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রের বাইরে এমন একটি শ্যামল শৈল প্রান্তর তার প্রান্তভাগকে ফুলে ফলে পাখীর গানে, মায়ের বুকের মতন স্নেহভরা উচ্ছ্বাসে পূর্ণ করে রেখে এমন হেসে আহ্বান কর্‌তে পারে যে, তাতে সকল ক্লান্তি, সমস্ত অবসাদ মায়ের হাতের স্পর্শের মতনই নিঃশেষে মুছিয়ে দিয়ে মানুষকে স্বর্গের শান্তি দান করতে সক্ষম হয়। কি উদারতা তার আকাশে! তার বাতাসে মেশানো কি পুঞ্জ পুঞ্জ সহানুভূতি!

ফেরবার সময় এলো, আমি যেন বাঁচলুম। বড় বড় ভোজ, থিয়েটার সমিতি, নাচ, মানবচিত্তের লঘুতার শত পরিচয়, উঃ! প্রাণটাকে যেন পাথরের জাঁতায় পিষে রেখেছিল। বন্দীর কাছে যেন জেল দারোগা তার মুক্তির পরওয়ানা পাঠ করে গ্যাছে—এমনিতরো আনন্দে শিশুর মতন উচ্ছ্বসিত হয়ে ভাবলুম আবার আমার সেই স্বর্গোদ্যানে ফিরে যেতে পাবো যেখানে আমার তারা আছে। নিশ্চয়ই আমার পথ চেয়ে আছে।

কত ছবির বই, কত সুন্দর সুন্দর খেলনা রংচংয়ে বিচিত্র সাজে সেজে রাস্তার দুধারের দোকানগুলো থেকে আমায় হেসে আহ্বান করলে। আরও তো কত বারই এদের মাঝখানকার এই সব রাস্তা দিয়ে আনাগোনা করেছি কিন্তু ‘ছেলেদের আমোদের জিনিষ’ আমার এই প্রৌঢ় সীমানার শেষ প্রান্তবর্ত্তী চিত্তকে এমন করে তো কই প্রলুব্ধ করেনি! আদর করে তাদের বুকের কাছে ধরে একটুখানি স্নেহ মিশিয়ে দিয়ে বাক্সর ভেতরে রেখে দিলুম, যাদের এসব দেব স্নেহটুকু তাদেরি যে প্রধান পাওনা! তারাই যে এটাকে এর অসাড় নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলেছে। দুর্গম পথে পাহাড় বন পেরিয়ে ফিরে এলুম; ঝাউতলা শূন্য — কাঞ্চী সেখানে নেই। আনন্দের প্রথম মুহূর্ত্তে সন্দেহ যেন একটা নিষ্ঠুর আঘাতের বেদনা জাগিয়ে দিলে। কটা দিনেই সে কি আমায় ভুলে গেল!

রাস্তা দিয়ে তাদের একটি প্রতিবেশী যাচ্ছিল, অত্যন্ত ত্রস্ত ভাব, তাকে ডেকে তাদের খপর জিজ্ঞেস কর্‌লুম। নিশ্চয়ই তারা আমায় ভোলনি, হয়ত অভির

পাঠশালার পরীক্ষা হয়ে যাওয়াতে আর কোথাও তারা বেড়াতে গেছে। সেই লোকটি নেপালি ক্ষত্রিয় নয়, গুর্খা। নাম বজীর সিং; সে গুন্ গুন্ করে কি বলে ব্যস্ত হয়ে চলে গেল, ঠিক বুঝ্তে পারলুম না, তবে এইটুকু মনে হলো যে, সে বল্লে অভিজিতের অসুখ, সে ওষুধ আন্তে চলেছে।

মুহূর্ত্তে আমার সোনার স্বপ্ন ভেঙ্গে নিদাঘের তপ্ত রৌদ্রে পৃথিবী দীপ্ত হয়ে উঠ্ল, হায়রে সংসারের অনিত্য সুখ!

অবস্থা খুব খারাপ! হ্যাঁ খুবই খারাপ অবস্থা। আমি প্রথমে গিয়েই তার নাম ধরে ডেকেছিলুম, মনটাও খুব উৎকণ্ঠিত ছিল, আর তা ছাড়া জানিনা তো যে এতদূর হয়েছে। তার মা খুব ব্যস্ত হয়ে হাত নেড়ে ইঙ্গিতে আমায় নিষেধ করে চুপি চুপি বলে উঠলেন "ওকে ডেকোনা, বাছা আমার পরীক্ষার জন্য পরিশ্রম করে বড় শ্রান্ত হয়ে একটু ঘুমুচ্ছে!"

মা বল্লেন "বটে যে—অভি ঘুমুচ্চে—কিন্তু আসলে তা নয় অবস্থা দেখেই বুঝ্লুম প্রবল জ্বরে সে সংজ্ঞা হীন, ঘুম কোথায়! সকাল বেলার শুকতারাটি যেমন ম্লান হতে হতে একেবারে আকাশের মধ্যে মিলিয়ে যায়, তার ন্যাতান দেহটুকুও যেন তেমনি করে মহাঘুমে ঢুলে পড়ছে, দুটি চোখে নিদ্রা যেন জড়িয়ে আছে, স্বাধীনচিত্ত সরল শিশুটি, আহা! সে যে তার পিতৃপিতামহের রাজদরবারের প্রতিপত্তিটুকু ফিরে পাবার জন্য প্রাণপাত করে পরিশ্রম কর্ছিল। এই কি তার পুরস্কার হলো!

কাঞ্চী দাদার তপ্ত ললাটে নীরবে বসে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, তার দুটি চোখের তারা নিমেষশূন্য হয়ে যেন তার দাদার শুক্নো ফুলের মতন ম্লানমুখের উপরেই মিশে গ্যাছে? আমার সাড়া পেয়ে সে এক বারটি কেবল চোখ তুলে আমার পানে দেখলে, কি গভীর হতাশা—সেই ভাসা চোখের কাতর চাউনিতে! সে দিকে যেন চাওয়া যায় না।

সহরের মধ্যে যিনি সবার চেয়ে ভাল চিকিৎসক, তাকেই আনালুম। তিনি রোগী দেখে মুখ অপ্রসন্ন কর্লেন। রোগীর মার দিকে চেয়ে ইংরেজিতে আমায় বল্লেন, "অবস্থা এখন ভারী মন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আশা ভারী কম।"

তাঁকে মিনতি করে বল্লুম, "চেষ্টা করুন হয়ত ভাল হবে, নৈলে মেয়েটি বাঁচবে না, তার যে ভাই অন্ত প্রাণ।"

ডাক্তার ঈষৎ বিস্ময়ের সঙ্গে আমার যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে ভাগ্যহীন জনক জননীর আর্ত্ত বেদনা

যাহারা প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করিতে অভ্যস্ত তাদের এতে আর বিস্ময় কোথায়? তিনি মৃদু ভাবে বল্লেন, "হ্যাঁ তাতো করাই চাই, আহা দিব্য ছেলেটি!"

আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌লুম, কিন্তু কি হবে সে চেষ্টায়, যার প্রথমে অতটা অগ্রাহ্য করা হয়ে গ্যাছে? রাত যখন এগারটা তখন হঠাৎ খুব ঘাম হতে লাগলো, আমার দিকে চেয়ে অস্ফুট বিদেশী ভাষায় আমার দেশেরই ডাক্তার বল্লেন "শেষ অবস্থা!" বলবার কিছুই দরকার ছিল না, অবস্থা নিজেই তা স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছিল।

দূরে ধর্ম্মশালার ঘড়িতে দ্বিপ্রহরের ঘোষণায় ঘুমন্ত স্তব্ধ রাত্রি যে সময় চকিত হয়ে উঠ্‌লো, ঠিক সেই সময়েই বালকের শেষ নিশ্বাস টুকু তার ক্ষুদ্র দেহপিঞ্জর ছেড়ে অনন্ত বায়ুর সঙ্গে মিশে গিয়ে কোন্ সেই অজানা শান্তির দেশের উদ্দেশে চলে গেল, যেখানকার কোন খবরই এপর্য্যন্ত কেউ পায়নি, চিরকাল ধরে শুধু একটা অনুমান ও কল্পনা চল্‌ছে।

তার নিস্পন্দ দেহ নিয়ে যখন আমার বৃথা আশার কুহকে পড়ে পরীক্ষা কর্‌চি, তখনও তার গভীর বিশ্বাসী মার মনে একটুখানিও সন্দেহ আসেনি যে, তাঁর স্নেহের ধন তাঁকে কত বড় ফাঁকি দিয়েছে। ব্যস্তহয়ে আমাদের হাত ঠেলে দিয়ে চুপি চুপি বল্লেন, "আহ কি করচেন ডাক্তাই মশাই! ওকে ঘুমুতে দিন, ক'দিন যে ছেলে ঘুমুতে পায়নি তাই অমন হয়ে পড়েছে। বাছারে আমার ঘুমা ঘুমা!"

না না, তোমার স্নেহের প্রসূন আজ যে শান্তিময় নিদ্রা লাভ করেছে। দুর্ব্বল মানবকণ্ঠের সহস্র আহ্বানও আর তাকে সে বিশ্রামের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে জাগাতে পারবে না। অনেক কষ্টে ভগিনীর দৃঢ় আলিঙ্গন থেকে ভাইকে ছাড়িয়ে নিয়ে নদী-তীরের শীতল মৃত্তিকানয়নে তার জ্বরতপ্ত দেহ খানিকে উত্তাপে শুষ্ক করিয়া আসা হ'লো। সন্ধ্যার স্থলপদ্মের মত মূখখানিও তখন কি সুন্দর! মার্ব্বেলের মতন সাদা কপাল থেকে তখনও প্রতিভার দীপ্তি যেন একেবারে নিঃশেষ হয়ে মুছে যায়নি। সে যে রাজার সৈন্যদলের জেনারেল হবে বেদনায় বুক ফেটে যেতে লাগলো। ওরে নিষ্ঠুর নিয়তি! বোঁটা-খসা এত ফুল গাছতলায় বিছানো থাকতে জোর করে অফুটন্ত কুঁড়িগুলিকে ছিঁড়ে নিয়ে একি তোর উদ্দাম চয়ন-সুখ।

সেই যে কাঞ্চী ভাইকে ছেড়ে তারই পরিত্যক্ত স্থানটি অধিকার কর্‌লে। আর সে সেখান থেকে উঠে বসলো না। ভূঁয়ের উপরে ম্লন জ্যোৎস্না রেখাটির মতনই সে নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়লো। আমি সেইখানে তার মাথার কাছে বসে তার অশ্রুহীন মুখের দিকে চেয়ে কত রকমে তাকে একটি কথা কওয়াবার চেষ্টা কর্‌তে লাগলুম,

কিন্তু আমার সকল চেষ্টাই বৃথা হয়ে গেল, তার চোখ দিয়ে একটি ফোঁটা জলও পড়্‌লো না।

তাদের মা তো বদ্ধ পাগল হয়ে গেছেন। নইলে কি আর তক্ষুনি উঠে দিব্য প্রসন্নমুখে তার জিনিষ পত্রগুলি গুছিয়ে গুছিয়ে রাখ্‌তে রাখ্‌তে আপনার মনে একটু একটু হাসছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে গুন্ গুন্ করে যোদ্ধার বিদায় অভিনন্দনের গানটি গাইতে গাইতে বলছিলেন, "ছেলে মানুষ এরি মধ্যে কেমন করে রাজার প্রধান সেনাপতি অতগুলো সৈন্যের নেতা হয়ে দাঁড়ালো। উঃ কি বীরত্ব!" মনে এইটে খেয়াল উঠেছে যে তাঁর বীরবংশের সন্তান অভি দেশের জন্যে যুদ্ধযাত্রা করেছে।

সেই রাত্রেই কাঞ্চীর জ্বর হলো। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল, রাত পোহাতেই ডাক্তারকে আনলুম। ডাক্তারটি বড় ভদ্রলোক। খুব যত্ন করে দেখ্‌তে লাগলেন! বল্লেন, "ভয় কি, এবার প্রথম থেকে যত্ন হ'চ্চে, চিকিৎসা হ'চ্ছে, নিশ্চয়ই সেরে যাবে?" আমিও তাই ভাবছিলুম।

প্রথমটা সে ওষুধ খেতে একটু আপত্তি করেছিল, শেষটায় আমার আগ্রহ-ব্যাকুল অনুরোধে সে আর কিছুতেই আপত্তি করতো না।

তিন দিনের দিন সে আর চোখ মেল্‌লে না। ডাক্তার মুখভার করে বল্লেন, 'সেই অবস্থা!' আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা তাড়িতের স্রোত ছুটে গিয়ে সর্ব্বশরীরের স্বচ্ছন্দ রক্তস্রোতকে হঠাৎ যেন জমিয়ে বরফ করে দিলে। ব্যাকুল হয়ে তাঁর হাত দুখানা চেপে ধরলুম, কি বল্‌চি কি কর্‌চি না জেনেই বলে উঠ্‌লুম বাঁচাও, আমার কাঞ্চী মায়ীকে বাঁচাও, সর্ব্বস্ব তোমায় দেব।

ডাক্তার মুখ আরও গম্ভীর করে বল্লেন, "ও দুটি আপনার তো কেউই হয় না, নেপালী ক্ষত্রিয়ের ছেলে, অত কাতর হ'চ্চেন কেন? আশা নেই— একেবারে নেই।"

আছে বই কি, নিশ্চয়ই আশা আছে, এমন কিছু অবস্থা কঠিন হয়নি, ডাক্তারেরই ভুল! চেষ্টা —শুধু চেষ্টা, শুধু যত্ন চাই! যেন আগুনের কুণ্ডব ভেতর দিয়ে ছুটে এসে ঘরে ঢুক্‌লুম। সেই একই ভাব! একি অবস্থা। আছে বসে উন্মাদিনী মা এদিকে চেয়ে আপনার মনে বিড় বিড় করে কি বকূচেন। তাড়াতাড়ি নতুন ওষুধই খানিক গ্লাসে ঢেলে নিয়ে তাকে খাইয়ে দিলুম। একবার চোখ চেয়ে আমার উৎকণ্ঠা-শঙ্কিত মুখের পানে তাকিয়ে একটু যেন করুণার মৃদুহাসি হেসে আবার সে চোখ বুজ্‌লে। আমার বুকের ভেতরে আশায় নিরাশায় জোয়ারের জলের ঢেউয়ের মতন রক্তের স্রোত ছলাৎ ছলাৎ করে আছড়াপাছড়ি কর্‌ছিল।

রাজার ডাক্তার এলেন। যন্ত্র দিয়ে, হাত দিয়ে, কান দিয়ে রোগীকে বিশেষ রকমে পরীক্ষা করে পকেটে হাত পূরে গম্ভীর হয়ে বাইরে এসে সুগন্ধি চুরোটে একটা টান্ দিয়ে বল্লেন, “আশা নেই।”

কি নির্ঘাত সে শব্দ! আর্ত্তভাবে দুই হাতে মুখখানা ঢাকা দিলুম, হা’রে আমার আশাহীন চিত্তের আশা! হা আমার স্বর্গ!

না। কে বলে আশা? নেই ভ্রান্তি! ভ্রান্তি! আছে বই কি আশা! ডাক্তার-ওরা কি জানে? কতটুকু শক্তি ওদের? আমি—ওকে বাঁচাবো। হ্যাঁ এই দৃঢ় চিত্তের সবটুকু বল দিয়ে, এই একান্ত হৃদয়ের নির্ম্মল নিঃস্বার্থ স্নেহধারা ঢেলে সেই, সঞ্জীবনী সুধায় ওই শুষ্ক লতা গাছটিকে—এই আমিই সঞ্জীবিত করে তুল্বো—পাব্বো না? ইচ্ছাশক্তির চেয়ে বড় জগতে কোন্ শক্তি আছে? এই প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে এসংসারে কি না বিপ্লব এই ক্ষুদ্র মানবশক্তির দ্বারায় সংঘটিত হয়েছে! এই শক্তির পূর্ণ প্রয়োগে মানুষ সর্ব্বক্ষম ঈশ্বরে পরিণত হতে কেন না পাব্বে? দেখি কে কেড়ে নিতে পারে ওই কচি প্রাণটিকে, এই বিশাল প্রাণের ভেতর থেকে! স্বয়ং বিধাতা আজ এসে দাঁড়ালেও তাঁকে ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হবে। পক্ষীমাতা যেমন করে তার ছোট বাচ্ছাটিকে ঝড়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে বুকের কাছে চেপে ধরে তেমনি করে তাকে দৃঢ় হস্তে নিজের কোলের কাছে টেনে নিলুম। আমার কুড়িয়ে পাওয়া পথের নিধি! বিধাতা আমায় দেননি, তিনি নেবেন কি অধিকারে।

ডাক্তারের ওষুধটার বুঝি ফল ফল্লো? না আমারি এই প্রবল ইচ্ছার বল মৃত্যুকেও আজ পরাস্ত কর্‌লে? ধন্য ঈশ্বর! ওই তো সে চেয়ে দেখ্‌ছে। একটুখানি ক্ষীণ নক্ষত্রালোকের মত ম্লান হাসি হেসে আমার কাঞ্চী মায়ী আমার হাতের মধ্যে তার ছোট হাতখানি স্থাপন করে আজ চার দিন পরে কথা কইলে, ঈষৎ যেন চম্‌কে উঠে বল্লে, “ঐ শুনুন!”

আনন্দে অধীর হয়ে তার শান্ত—তত রোগ যন্ত্রণাতেও শান্ত—ললাটে চুম্বন কর্‌লুম, “কি শুনবোইবা!”

অন্যমনস্ক ভাবে যেন কোন একটা দূরস্থ ধ্বনি বা এমনি কিছু একটা শুনতে চেষ্টা কর্‌ছিল, আবার দুটিও আমারি মতন তাদের স্বর্গের মতন পবিত্র প্রাণ দুটি আমার সঙ্গে বদল করেছে। এ ত আমার মতন একটু হেসে উত্তর করলে, “শুন্‌তে পাচ্ছেন না, ঐ যে অভি আমায় ডাকচে!”

একটু সুখের হাসি হেসে হঠাৎ ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে গভীর রজনীর স্তব্ধতাকে যেন চকিত করে তুলে বলে উঠলো, “যাই অভি যাই, দাঁড়াও তুমি!”

তার ক্ষীণ কণ্ঠ ঘরের মধ্যে ব্যগ্র আকুলতায় প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে আমায় লৌহদণ্ডের মতন আঘাত কর্‌লে, আর্ত্তনাদের সঙ্গে তাকে বুকে চেপে ধর্‌লুম—কোথা যাবি মা আমার আমি তোকে যেতে দেব না!”

আমার আহ্বানে বারেক সে যেন একটু বিচলিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তার রোগশোককাতর মুখের সমস্ত শ্রান্তি ও অবসাদকে নিঃশেষ করে মুছে দিয়ে গভীর শান্তির ছায়া বিজয়ের হাসিটুকুর সঙ্গে ফুটে উঠে আমায় যেন ধিক্কার দিয়ে ভর্ৎসনা করে বলতে লাগল—কি আছে এই পৃথিবীতে যার জন্যে এই আনন্দ আর এই অফুরন্ত শান্তি থেকে বঞ্চিত করে এখানে ধরে রাখতে এত চেষ্টা? যে শান্তির চিহ্ন ইতিমধ্যে তার এই পরিত্যক্ত ক্লান্ত দেহে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

কি স্নেহঋণ শোধ কর্‌তে কোন্ আলোকের রাজ্য থেকে তারা দুটিতে এক সঙ্গে নেমে এসেছিল? অন্ধকে তারা যে দৃষ্টিদান করেছিল তা’ কি কেবল সেই আলোটুকু ধ্যান কর্ব্বার জন্য—যা বিদ্যুতের মতনই চঞ্চল কিন্তু শারদ জ্যোৎস্নারই মতন স্নিগ্ধ!

সোনা দিয়ে মাজা তার রুক্ষ চুলগুলি সাদা গোলাপের মতন মুখখানিকে ঢেকে ফেলেছিল, আমি সাবধানে সরিয়ে দিতে গেলুম, কি ঠাণ্ডা সে মুখ!!

শক্তি গর্ব্বে অন্ধ হয়ে তুমি মনে করে থাক তোমার ইচ্ছা তোমার শক্তি বিধাতার বিধানকেও বুঝি বদল করতে সক্ষম! তাই তাঁর দেওয়া দণ্ড পুরস্কারের নীচে মাথা পেতে না দিয়ে তাঁকে রুদ্ধ তাপে পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেল্‌তে সকল সময় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এতবড় স্পর্ধা তুমি কোথা থেকে পেলে মানব? অসীম সাগরের সুক্ষ্মতম বালুকণা! তুমি যে কতটুকু তোমার সুখ-দুঃখ লাভ লোকসান তোমার চেষ্টা সাধনায় এই বিশ্বনিয়মের নিয়মতন্ত্রের অপরিবর্ত্তনীয় বিধানের নিকট যে কতখানি তুচ্ছ এখন কি তা বুঝতে পেরেছ গর্ব্বান্ধ মানব-অণু?

---

# প্রতিশোধ

## ১

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের এক সুন্দর সৌম্য অপরাহ্নে যখন পিতা পুত্রীতে বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইতেছিলেন, সেই সময়ে দুই তিন জন বন্ধু ও ডাক্তার ডাইকাউন্টের শোণিতাক্ত দেহ বহন করিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিল!

ডাক্তার বলিলেন, আজ সকালে তাহার সহিত নবীন ব্যারণ ডিরোলেডের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়। ব্যারণ ডিরোলেড তরবারি ক্রীড়ায় অত্যন্ত সুকৌশলী। ডাইকাউন্ট বক্ষে গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন। তাঁহারা কোন ক্রমেই শোণিত ক্ষয় নিবারণ করিতে না পারিয়া এবং মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া তাঁহার শেষ মুহূর্ত্ত নিজের গৃহে পিতা ও ভগিনীর স্নেহ হস্তের শুশ্রুষায় একটুখানিও শান্তিপূর্ণ হইতে পারে মনে করিয়া তাঁহাকে এখানে আনিয়াছেন! মৃত্যুর তাঁহার আর অধিক বিলম্ব নাই!

বিবাদের কারণ তাহারা বলিতে পারিলেন না, হয়ত কোন উজ্জল-নয়না হাস্য রঞ্জিতাধরা রাজ্ঞীর সহচরীই এই উষ্ণ মস্তিষ্ক যুবকদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি আক্রমণের হেতু হইতে পারে, হয়ত অপর কোন কিছুও হইতে পারে তবে প্রথমোক্ত কারণটাই এবং প্রায় এরূপস্থলে বর্ত্তমান থাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

যখন মৃত্যু আসিয়া বালকের কালীমা লিপ্ত ললাট শান্তির হস্ত স্পর্শে মর্ম্মর শুভ্র করিয়া দিল, যন্ত্রণার ক্ষীণ রুদ্ধশ্বাস স্থির হইয়া একেবারেই থামিয়া গেল, এবং বন্ধুগণ একে একে ম্লান মুখে মৌন বিষাদে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন, কেবল গভীর শোকের অনির্ব্বাণ যন্ত্রণানল বক্ষে লইয়া বৃদ্ধ কাউন্ট মার্ণিক তাহার বালিকা কন্যার সহিত একাকী হইলেন। তখন সহসা নতদৃষ্ট্রি তুলিয়া বৃদ্ধ তাঁহার নির্ব্বক-প্রতিমার মত নিস্তব্ধ কন্যার অবসন্ন একখানা হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহা তাহার মৃত ভ্রাতার বরফের মত শীতল ও শুভ্র ললাটের উপর স্থাপন করিয়া অকম্পিত কঠিন স্বরে কহিলেন, "জুলিয়েট্! আমার দিন একেবারে সন্ধ্যায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, একটু আর অবসর আমার নাই, কিন্তু

তোমার সম্মুখে দীর্ঘ —দীর্ঘ অবসর পড়িয়া আছে, আমার কাছে আজ প্রতিজ্ঞা কর, তোমার ভাই এর এই শোচনীয় মৃত্যু যে ঘটাইল সে ইহার প্রতিশোধ পাইবে।”

জুলিয়েট মন্ত্র বশীভূতের মতই ধীরে ধীরে বলিল, “হ্যাঁ পাইবে।”

“শপথ করো সেই হত্যাকারীর রক্তধারায় তুমি আমায় স্নান করাইবে, জেনো জুলি জেনো আমার মৃত আত্মা তোমার নিকট তার এ প্রাণের তৃষ্ণা বহন করিয়া আনিতে নিবৃত্ত হবে না। আবার বলো—সে প্রতিশোধ পাইবে, আবার শপথ করো, —তুমি বুদ্ধিমতী তুমি অকৃতকার্য্য হবে না বলে—অঙ্গীকার করো”

আবার জুলিয়েট তেমনি স্বপ্নাভিভূতের মত পিতার আদেশের পুনরুচ্চারণ করিল। তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ অসাড় হস্ত এবং স্পন্দহীন মনে জীবনীশক্তির চিহ্ন বিদ্যমান ছিল না। বৃদ্ধ নিজের দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া তাহার মাথার উপর রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে গেলেন কিন্তু সে হাত কাঁপিয়া পড়িয়া গেল, ওষ্ঠ একটুও শব্দ উচ্চারণ করিল না।

## ২

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের সেই ভয়ানক যুদ্ধের পর সহরের কোন রাজপথে ভদ্র মহিলাগণের গমনাগমনের পক্ষে নিরাপদ ছিল না।

রাস্তার সমুদয় লোক সেই জন্যই সেদিন দ্বিপ্রহরে একটা সুন্দরী যুবতীকে একাকী দক্ষিণ দিক্ হইতে রাজপথের উত্তর দিকে গমন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যে তাহার দিকে চাহিতেছিল।

রমণীর শুভ্র পরিচ্ছদের উপরে তিন বর্ণে চিত্রিত রিপবলিক চিহ্ন কোমর দিয়া জড়ান ছিল, সেইটিই যে তাহাকে এতখানি পথ নির্ব্বিঘ্ন রাখিয়াছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ ছিল না কিন্তু সেই নির্ব্বোধ বালিকা সহসা একটা কি অদ্ভুত উত্তেজনার বশে সে কথা এক মুহুর্ত্তের মধ্যে ভুলিয়া গিয়া নিজের ধ্বংসের পথ নিজের হাতে প্রস্তুত করিয়া দিল। সে দেশপ্রসিদ্ধ নাগরিক-প্রধান ডিরোলেডের প্রকাণ্ড অট্টালিকার কাছে আসিয়াই সেই রক্ষাকবচ দেহ হইতে খুলিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং সেই ছিন্ন খণ্ডগুলি মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আবার অগ্রসর হইল।

এই অসীম সাহসীকতা এক মুহূর্ত্তের জন্য পথিকদিগকে বিস্মিয় স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছিল কিন্তু পরক্ষণেই এই স্বদেশদ্রোহিতা প্রত্যেক ব্যক্তিকে অগ্নি

প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল, এক সঙ্গে বিংশকণ্ঠ চিৎকার করিয়া উঠিল, রিপবলিকের অপমানকারিণীকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

শীকার সম্মুখে পাইলে ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রীর দল যেমন করিয়া গর্জ্জিয়া তাহার রক্তপান করিতে ছুটিয়া আসে, প্যারিসের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর পঞ্চাশজন নরনারী —তেমনি হিংস্র—তেমনি শোণিত পিপাসু—তেমনি করিয়াই সেই অসহায় বালিকাকে ঘিরিয়া ফেলিল। প্রত্যেকেই তাহাদের হিংস্র পশুর মত দীর্ঘ নখের দ্বারা কোমল পুষ্প পেলবের মত তাহাকে তেমনি সহজে সহজে তেমনি অকরুণতীত ছিন্ন করিয়া ফেলিতে সক্ষম!

রমণী নিজের বিপদের কথা নিজের দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিত উত্তেজনার পর মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিয়াছিল। ব্যাকুলভাবে তাই সে সম্মুখের সেই প্রকাণ্ড প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকার দ্বারের দিকে ছুটিয়া গেল। কিন্তু এই বিপ্লবের দিনে কি কেহ নিজের গৃহদ্বার বিপদকে বরণ করিবার জন্য খুলিয়া রাখে?

হতাশ হইয়া নারী তখন দ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল, বিপদকে সম্মুখে করিয়া দাড়ান—তাহার পিছন হইতে আক্রমণের চেয়ে অনেক ভাল।

কিন্তু সেইটুকু হীনতার মধ্যে ফেলিয়া নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা পরায়ণ উন্মত্ত নরনারীগণ তাহাকে মুক্তি দিল না! তাহারা তাহার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছিল, তাহার পোষাকের প্রান্ত ধরিয়া তাহাদের নির্দ্দয়ভাবে একজন সজোরে আকর্ষণ করিল।

শেষ মুহুর্তেও যাহা সে করিবে না স্থির করিয়াছিল, যখন পৈশাচিক বিভীষিকাপূর্ণ মৃত্যু আসিয়া মমতাহীন কঠোর হস্তে তাহার তরুণ সুকোমল অঙ্গ হৃদয়হীন ভাবে স্পর্শ করিল তখনও সে আর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে এমন সুকুমারী বালিকার পক্ষে সম্ভব নয়। সেও এবার আর আত্মদমন করিতে পারিল না। মৃত্যু! শুধু কি মৃত্যু! পশু পক্ষীর চেয়েও হেয় কীট পতঙ্গের অপেক্ষা ও ঘৃণ্য মৃত্যু! আর্ত্ত ভাবে সে দ্বারে আঘাত করিয়া প্রাণপণ চিৎকার করিয়া ডাকিল “রক্ষা করো সিটিজেন্ ডিরোলেড। আমায় আশ্রয় দিয়া এ অপমানিত মরণের হাত হইতে বাঁচাও।”

পৈশাচিক হাস্যে পিশাচের দল নৃত্য করিয়া উঠিল, সকরুণ প্রার্থনা টুকু তাহাদেরই উচ্চ চিৎকারে আতঙ্কে যেন মরিয়া গেল বলিয়াই বোধ হইয়াছিল; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া গেল এবং দুইটী সবল বাহ বিনা দ্বিধায় মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার কটি বেষ্টন পূর্ব্বক তাহাকে জোর করিয়া এই মুক্ত দ্বার পথে ভিতরে টানিয়া লইতে বিলম্ব করিল না। তাঁহার সজোর আকর্ষণে আততায়ীর হস্ত

বালিকার পোষাকের একটা ছিন্ন অংশ মাত্র ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইল। তাহাকে ধৃত রাখিতে পারিল না।

কয়েক মিনিট পরে অবসন্নতা হইতে সংজ্ঞা লাভ করিয়া বালিকা দেখিল, সে একটা সুসজ্জিত গৃহের একখানি সুকোমল সোফায় শয়ন করিয়া আছে, এবং তাহার পাশে বসিয়া একজন বর্ষীয়সী রমণী সস্নেহ চক্ষে তাহার ভয় মুর্চ্ছিত মুখের পানে চাহিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন!

বালিকা ক্লান্ত মস্তক উঠাইয়া ধীরে ধীরে একবার ঘরের চারিদিকেই চাহিয়া দেখিল, খোলা জানালার মধ্য দিয়া একটা যে কোলাহল আসিতেছিল কিন্তু সেই শব্দের উপর আরও একটা উচ্চ আদেশের স্বরও সেই সঙ্গে শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল! রাজা যে স্বরে তাহার পারিপার্শীগণকে, প্রভু যে কণ্ঠে দুর্ব্বিনীত ভৃত্যকে আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন এও সেই প্রকার অলঙ্ঘ্য আদেশের স্বর!

গৃহকর্ত্তী তাহার কৌতূহল বুঝিয়াই যেন গর্ব্বমিশ্রিত গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, "ও আমার ছেলের গলার শব্দ! যা হোক্ মাদ্‌ময়সেল্! এখানে তোমার কোন ভয় কর্ব্বার দরকার নেই, তুমি বোধ হয় জান —তুমি এখন সিটিজেন ডিরোলেডের গৃহে অতিথি হইয়াছ।

এক মুহূর্ত্তের জন্য বালিকার মুখ যেন কি এক গভীর বেদনায় কি এক রকম হইয়া গেল! কিন্তু সে তখনি আত্মসংযত হইয়া সেই মুহূর্ত্তেই গৃহ প্রবিষ্ট গৃহস্বামীর প্রতি ফিরিয়া সেই ভয়ানক বিপদের হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিল না।

এই রূপবতী বালিকাকে তাহার সেই অসহায় অবস্থায় ছিন্ন বসনে এবং ভয়চকিত অথচ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অত্যন্ত সুন্দর দেখাইতেছিল, নাগরিক প্রধান ডিরোলেড তাহার প্রসারিত ক্ষুদ্র হাতখানি গভীর সহানুভূতি ও পূর্ণ প্রশংসার সহিত সসম্ভ্রমে তুলিয়া ধরিয়া তাহা চুম্বন করিলেন। তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই ছিল না। কেন না ডিরোলেডও প্যারির ভিতর একজন পরম সুপুরুষ এবং যুবাপুরুষ মাত্র। যদিও ঐ প্রণয় জ্ঞাপক প্রীতি চিহ্নকে এখন তাঁহারা অভিজাতগুণের দুর্ব্বলতার চিহ্ন বলিয়াই উপহাস করিয়া থাকেন, কিন্তু কারণভেদে কার্য্যও সময় সময় যুক্তির বশীভূত থাকে না। তাঁহারই বা ইহাতে এমন বেশী দোষ কি? সবারই এমন হয়।

এই ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে সিটিজেন ডিরোলেডের সুসজ্জিত পাঠাগারে এক ঈষৎ শীতোষ্ণ সন্ধ্যায় একখানি সবুজ বস্ত্রাবৃত টেবিলের চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া পাঁচজন ভদ্রলোক তাস খেলিতেছিল। টেবিলের উপর স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে পুষ্প ও সিগারেট সাজান আছে, ঘরে অনেক আলো জ্বলিতেছে; তাহাদের প্রত্যেকের হাতে কয়েকখানা তাসও রহিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে টেবিলের উপরে তাহাদের হস্ত হইতে তাহা নামিয়াও আসিতেছিল। কিন্তু তবুও তাহাদের মুখের উৎকণ্ঠিত সাবধান সতর্ক ভাবেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছিল যে তাহা ক্রীড়ার উত্তেজনা নয়, কোন গূঢ় রহস্যপূর্ণ মন্ত্রণার সংশয়াচ্ছন্ন উদ্দীপনা। বাতাসে প্রত্যেক কম্পনটি পর্য্যন্ত তাহাদের চকিত করিয়া তুলিয়া তাহাদের সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিকে স্থুল পর্দ্দায় আচ্ছাদিত দ্বার ও রুদ্ধ জানালার দিকে টানিয়া ফিরাইতেছিল।

গৃহস্বামী উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক ও দৈহিক সৌন্দর্য্যে সমধিক সুন্দর কান্তি সতেজ মূর্ত্তি যুবক হইলেও সকলের অপেক্ষা তাহাকেই সাহসী ও উদ্যমশীল বলিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছিল। সজোরে তাস ফেলিয়া বিপক্ষের তাস জিতিয়া লইতে লইতে সে বলিল, “নিশ্চয়ই আমরা কৃতকার্য্য হবো। না হবার কি কারণ আছে বলো? আমরা পাঁচজনে মাত্র এই পরামর্শ স্থির করেছি বইত নয়, তা ভিন্ন কেহই একথা জানে না, কেন আমরা অকৃতকার্য্য হবে?”

এক জন নিমন্ত্রিত উত্তর করিলেন, “যদি আমাদের ভিতরে কেহ বিশ্বাসঘাতক না থাকে তবে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব নয়। এই একমাত্র উপায়ে দুর্ভাগিনী রাজ্ঞীকে উদ্ধার কর্‌তে পারা যায় কিন্তু একাজে টাকা অনেক দরকার হবে।” ভিরোলেড সোৎসাহে কহিয়া উঠিল, “ভাগ্য আমাদের প্রতি এবিষয়ে আশ্চর্য্য সাহায্য কর্‌ছে দেখ। কাল্‌কের পর হতেই আমি কনসারজারির গভর্ণরের কাজ পাবো, যদিও রাণীর সঙ্গে কথা বলা আমার সুবিধা হবে না; কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁর হাতে টাকা কড়ি ও চিঠিপত্র দেবার সুযোগও পেতে পার্ব্বোতো, আহা! ঈশ্বর তাঁকে এ বিপদ হতে উদ্ধার করুন।”

“কিন্তু সে টাকা ও চিঠিপত্র এখানেই কি, খুব নিরাপদে আছে?”

ডিরোলেড পূর্ব্বাপেক্ষাও উৎসাহের সহিত উত্তর করিল, “নিশ্চয়! আমার মাকে—তোমরা নিশ্চয়ই ভালরূপেই জানো। আমাদেরি মত তিনিও মনে মনে সম্পূর্ণ রূপ অত্যাচারিতেরই পক্ষ। তা এইতো আমরা দুজন, আর আমাদের বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য দুইটি। যদিও তারা এসম্বন্ধে কিছুই জানে না কিন্তু

জান্‌লেও তারা বরং মৃত্যুকে বরণ করবে তবু আমাদের কোন রহস্য প্রকাশ কর্ব্বে না। সে সমস্ত এই ডেক্সটার ভিতর যথেষ্ট সাবধানেই রেখেছি।”

অন্য সকলেই এই কৈফিয়তে বোধ করি খুসী হইয়াই মৌন সম্মতি লক্ষণের হিসাবে নীরব রহিল কিন্তু তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ এক ব্যক্তি একটু অসন্তোষের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিন্তু সিটিজেন ডিরোলেড! তোমার বাড়ীতে আজকাল যে স্ত্রীলোকটি বাস করেন তাঁর কথাতো তুমি কই কিছুই ভাব্‌চোনাতো?”

রাজতন্ত্রের উপাসিকা যে মুক্ত রাজপথে দাঁড়িয়ে নিজের ভয়ানক বিপদ্‌ সম্মুখে জেনেও নিজের বিশ্বাস নিজের ধারণাকে ছদ্মবেশের আবরণে ঢেকে রাখা সহ্য করতে পারেনি বলে আজ আমার এ গৃহ পবিত্র কর্‌তে বাধ্য হয়েছে। ডিরোলেড আকোচঞ্চল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে, সে কি একটি আশ্চর্য্যরূপ সুন্দরতম পবিত্রতম হৃদয়, তাকে তোমার এত অবিশ্বাস কেন? এত ভয় কিসের?”

সমাগত ব্যক্তিগণের অধরপ্রান্ত ঈষৎ হাস্যের আভাষে একসময়েই কুঞ্চিত হইয়া আসিল কিন্তু সেই সকৌতূক ইঙ্গিত অবজ্ঞাতর দৃষ্টি এড়াইল না। ডিরোলেড ইহা দেখিতে পাইয়া ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল, “তা ছাড়া সে এর কিছুই জানে না এবং জান্‌তে ইচ্ছা সে কর্ব্বেও না। আমি তোমাদের শপথ করে বল্‌ছি বরং তুমি আমি অবিশ্বাসী হতে পারি তথাপি সেই দেবীর মতন পবিত্র মুখ যার, সে অবিশ্বাসী হ’তে পারে না।” না হলেই ভাল ভাই কিন্তু কি জান সাবধানের মার নাই!

আরও এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তর্কের শেষ সিদ্ধান্ত সকলকার মনঃপূত হইলে তখন আগন্তুক চারিজন প্রস্থানোদ্যত হইয়া নিজেদের সর্ব্বাঙ্গ কালো চোগায় আবৃত করিয়া মুখের উপর টুপির চওড়া কার্ণিসগুলা টানিয়া দিয়া ডিরোলেডকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইলে পরে এক ব্যক্তি এই সময়ে সহসা প্রস্তাব করিল, “এসো আমরা সচক্ষে সেই চিঠিপত্রগুলো কোথায় আছে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই। সিটিজেন্‌ ডিরোলেড! তোমার মতন তরুণ যোদ্ধার হৃদয়েই এত বড় একটা দায়িত্বের সাহস, সঞ্চিত থাকা সম্ভব, যাতে তুমি এখন একটা মস্ত ভার নিজের হাতে স্বেচ্ছায় নিচ্চ।”

“আমি ভয় জিনিষটাকে কোন দিনই এজীবনে প্রত্যক্ষ করতে পারলাম না।” সগর্ব্বে এই কথা বলিয়া ডিরোলেড ডেক্সের চাবি নিজের বুক পকেট হইতে বাহির করিয়া ডেক্স খুলিয়া তাহার মধ্যের গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত একটি রেশমি আবরণে

জড়িত বাক্স বাহির করিয়া বলিল, "এই বাক্সটির ভিতরে আমাদের মাননীয়া রাজ্ঞীকে ঐ সকল রক্তপিপাসু বাঘ গুলার থাবা থেকে মুক্ত কর্ব্বার জন্য যা কিছু সঞ্চয় সবই সঞ্চিত আছে।"

সহসা ডিরোলেডের হাতে বাক্সটি কাঁপিয়া উঠিল, সকলেই ভূতাহতের মত এক সঙ্গেই দ্বারের দিকে ফিরিয়া চাহিল, দ্বার সেই মুহূর্ত্তে নিঃশব্দে ও ধীরে ধীরে খুলিয়া গিয়াছিল। এক হাতে পিছনকার ভারী পর্দ্দাখানাকে ঠেলিয়া রাখিয়া জুলিয়েট দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া।

"মুসো ডিরোলেড! ম্যাডাম ডিরোলেড আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে বল্লেন যে এঁদের জন্য কিছু জলযোগের বন্দোবস্ত করে রেখেছেন, তা কি এখন পাঠাতে পারেন?"

ডিরোলেড একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে কিশোরী তরুণীর মুখের পানে চাহিয়া, দেখিল; সরলতার একখানি চিত্র তাহার সেই দ্বারের উপরে ঘন সবুজ পর্দ্দাটায় কোন সে অপূর্ব্ব শিল্পী আঁকিয়া দিয়া গিয়াছে। আশ্বাসের মৃদু হাসি হাসিয়া অকম্পিত হস্তে যথাস্থানে সেই সাঙ্ঘাতিক বাক্সটি রাখিয়া ডেক্সটা বন্ধ করিয়া উঠিয়া আসিয়া তাহাকে ধন্যবাদের সহিত যাহা বলিবার ছিল বলিয়া অল্প পরেই বিদায় দিল। অন্য কয়জনও তখন একটু যেন প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। একজন ভিন্ন সকলেই তাহাদের নিমন্ত্রকের মতের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া এই দেবী-মুর্ত্তির সম্বন্ধে নির্ভয় হইতে প্রস্তুত হইলেন এবং কিছুক্ষণ মাত্র পরেই বিদায় লইলেন। আহা এমনি করিয়াই মানুষ নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনে গো! তাঁহারা যদি আর একবার ভাল করিয়া সেই সরল স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন। অথবা তাঁহাদের যুবক বন্ধুর চোখের মায়ার বন্ধন খুলিয়া দিয়া তাহার স্বেচ্ছান্ধতা বিদূরিত করিবার জন্য একটু চেষ্টাও পাইতেন! যদিও সেই ফ্রান্সের মধ্যের সেই সর্ব্বোত্তম হস্তের বন্ধন খুলিয়া ফেলা তাঁদের পক্ষেই খুবই সহজ হইত না এবং বন্ধনকারিণীর পদ্ম হস্তের স্পর্শ সৌরভের স্মৃতি দূর করা আরও কঠিন হইত। তবু তোমরা এই সব অসমসাহসিকতার চেষ্টাকারী, তাঁদের এই কঠিন কাজটাতেও একবার বুক দিয়া চেষ্টা করা উচিত ছিল।

জুলিয়েট্‌ দ্বারের বাহিরে আসিয়া এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তারপর সবলে দুই হাত দিয়া নিজের বুক খানাকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার উদ্দাম চঞ্চলতাকে রোধ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। বিজয়ের সগর্ব্ব আনন্দের সহিত প্রতিহিংসার কঠোর জ্বালা মিশ্রিত হইয়া তাহার শান্তশ্রীকে এক মুহূর্ত্তের জন্য ভীষণ করিয়াই তুলিয়াছিল। এই মিমাংসা কঠোর মুখেই অন্ধ

পতঙ্গকুল মুহূর্ত্তমাত্র পূর্ব্বে সরলতার উজ্জ্বল আলোকে দিব্যকান্তি সন্দর্শন করিতেছিলেন না?

## ৪

পর দিন সন্ধ্যার সময় ডিরোলেড তাহার পুত্রবৎসলা জননীও নিরাপদে নিজ গৃহত্যাগ করিয়া সন্দেহ সঙ্কুল, বিপর্যয়পূর্ণ নৃতন কার্য্য-ভার গ্রহণ করিবার জন্য কিছু দিনের মতই বিদায় লইল। কন্‌সারজারির অস্থায়ী গভর্ণরের পদে সে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং সর্ব্বদাই মনে করিয়া ছিল যে, যে বিপ্লব তাহার অনেকে মিলিয়া দেশের বুকে টানিয়া আনিয়াছে তাহারই সংঘর্ষে নিদারুণ অত্যাচারে উৎপীড়িতা দুর্ভাগিণী রাণীকে মুক্ত করিবার এই উত্তম অবসর। এ সুযোগ যদি ব্যর্থ হইয়া যায় তবে ফ্রান্সের মাতৃ রক্তে তাহাকে স্নাত হইতেই হইবে। আর কোন উপায় নাই।

ডিরোলেড মায়ের শয়ন গৃহ হইতে তাঁহার অশ্রু হীন আশীর্ব্বাদে ও স্নেহ চুম্বনে ক্লান্তিহীন চিত্তে ফিরিয়া নিজের পাঠাগারে আসিয়া একটুখানি কি ভাবিয়া লইল। যাত্রার সমুদয় উদ্যোগ প্রস্তুত, সেই ভয়ানক বিপদ জনক বাক্স একটি রেশমি ধামে আঁটিয়া নিজের হাতে লইয়া সে একটু সঙ্কুচিত ভাবে ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল, “মাদ্‌ময়সেল জুলিয়েট্‌কে বলো তিনি যদি একবার দয়া করে আমার সঙ্গে বিদায় সাক্ষাৎ কর্‌তে আসেন তা’হলে তাঁর কাছে নিরতিশয় বাধিত হই—” তারপর একটু থামিয়া একটা ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া আদেশ দিল “আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ী যেন থাকে প্রস্তুত।”

প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জুলিয়েট্‌ ধীরশান্ত গতিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। দুই চোখে আগ্রহ ভরিয়া ডিরোলেড তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল,— সুন্দর উন্নত দেহ, মুখও তেমনি প্রশান্ত। কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র ওষ্ঠ এত বিবর্ণ ও কম্পিত হইতেছিল, এবং বিস্ফারিত নেত্রে এমনি একটা অদ্ভুত দৃষ্টি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে ডিরোলেড তাহা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যানুভব করিল। তাহার নিকটে আসিয়া ভূতপূর্ব্ব ব্যারণ নম্র ও মৃদুস্বরে কহিল, “আমার অনুরোধ রক্ষা করে আমায় যে দয়া দেখিয়েছ, সেজন্য তোমায় কি বলে ধন্যবাদ দেব স্থির করতে পার্‌চিনে মাদ্‌ময়সেল্‌।”

অশাসিত নীচ বিদ্রোহী দলকে উচ্চ গম্ভীর রাজকীয় স্বরে শাসন করা যাহার অভ্যস্ত, অহার কণ্ঠে ততখানি সকরুণ স্বর শুনিলে কেমন যেন বিসদৃশ ও হাস্যকর লাগিতে থাকে। তথাপি বক্তার কণ্ঠে ও ভাবে কোনই অসামঞ্জস্য ছিল না

বরং খুব একটা ঐকান্তিকতাই ছিল। একটুখানি নিরব থাকিয়া অল্পপরেই ডিরোলেড বলিল, "ঈশ্বরের নিকট আমার মার জন্য প্রার্থনা করে মাদ্‌ময়সেল, তিনি তোমার প্রার্থনায় তাঁকে শান্ত রাখ্বেন, মা আমার তাঁর শেষ পুত্রটি নিয়েই সংসার কর্‌ছিলেন আর—" ডিরোলেড থামিলেন।

জুলিয়েট্‌ সহজ ভাব রক্ষা করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল —"আপনি বোধ হয় খুব বেশী দিনের জন্য যাচ্ছেন না?"

জুলিয়েটের পা কাঁপিতেছিল, এই নিজের করা প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গেই সে যেন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। ডিরোলেড তাহাকে হাত বাড়াইয়া তৎক্ষণাৎ ধরিয়া না ফেলিলে সে হয়ত মাটিতে পড়িয়াই যাইত।

সম্মুখের একখানা সোফায় তাহাকে বসাইয়া ডিরোলেড তাহার পাশে একখানা নীচু চৌকির উপর বসিয়া একটু শুষ্ক ভাবে হাসিয়া উত্তর করিল, "এখনকার দিনে যেকোন বিদায়ই যে চিরবিদায় হ'তে পারে না। মাদ্‌ময়সেল্‌! কে একথা জোর করে বল্‌তে পারে? তবে আপাততঃ আমি এক মাসের জন্য কনসারজারিতে দূর্ভাগিণী রাজ্ঞীর ভার নেবার জন্যই যাচ্চি, তারপর আবার কি ঘটে!"

"যে কোন কারণেই হোক্‌ তা'হলে আজ রাত্রের বিদায় আমাদের বহুদিনের বিদায়ই হবে বোধ হ'চ্ছে—না, সিটিজেন্‌ ডিরোলেড?"

এই একমাস আমার নিকটে এক শতাব্দীর মতই দীর্ঘ বলে আজ মনে হ'চ্ছে, বিশেষ যখন তোমায় না দেখে আমায় এই এক মাস কাটাতে হবে। কিন্তু যেন অনিচ্ছার সহিত আত্মবিস্মৃত ভাবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভূতপূর্ব্ব ব্যারণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনীর সেই আশ্চর্য্য দৃষ্টির মধ্যে অনুসন্ধিৎসুনেত্রে চাহিয়া রহিল। তারপর অত্যন্ত মৃদুস্বরে সন্দেহপূর্ণ আশার সহিত ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "কিন্তু তোমারও এই একমাস সময়কে দীর্ঘবোধ কর্ব্বার কারণও যে আমার সঙ্গে এক, এত বড় আশাটা কর্‌তেও যেন আমি সাহস কর্‌তে পার্‌ছি না মাদ্‌ময়সেল্‌!"

জুলিয়েট মুহূর্ত্তে বিবর্ণতর হইয়া উঠিয়া তড়িৎবেগে নিজের হাতটা সরাইয়া লইল। ডিরোলেড তাহার হাত খানি নিজের কম্পিত হস্তে ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। একটু সরিয়া বসিয়া সে বলিয়া উঠিল, "আপনি আমায় ঠিক বুঝতে পারেন নি মুসো সিটিজেন্‌, আমার বলার অর্থ এই যে আমি আর বেশী দিন মাদাম ডিরোলেডের করুণাপূর্ণ আতিথ্য নিতে এখানে থাক্‌তে পার্ব্বে না—অনেক দিন থেকেই আমি তাঁর বিশ্বাস ও আদরের মধ্যে অনধিকার দখল নিয়ে রয়েছি এবং—"

তাহাকে বাধা দিয়া অত্যন্ত বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে তিরস্কারের ভাবে ডিরোলেড কহিল, “তুমি আমাদের কাছে থেকে কি তা’হলে সুখী নও মাদ্‌ময়সেল্? তুমি, আমাদের তা’হলে ছেড়ে যেতে চাও—”

জুলিয়েট্ উচ্চ যন্ত্রণাপরিপূর্ণ কণ্ঠে আর্ত্তনাদের মত করিয়া বলিয়া উঠিল, “ঈশ্বরের দিব্য আপনি আমায় অমন করে ব’ল্বেন না। আপনি জানেন না—আপনি বুঝ্‌তে পারছেন না—তা’হলে আপনার—”

“নিশ্চয়ই আমি বুঝ্‌তে পেরেছি জুলিয়েট্—আমি তোমায় ঠিকই বুঝেছি,—” অদৃষ্ট তাহার জন্য নিজের ভাণ্ডারে কিসের সঞ্চয় রাখিয়াছে,—সে কি? আশা নিরাশা তাহা পরীক্ষার জন্য ডিরোলেড আর বেশীক্ষণ পরীক্ষকের আসনে বসিয়া কালক্ষেপ করিতে পারিল না। পূর্ণ বিশ্বাসেই বলিয়া যাইতে লাগিল—“আমি তোমার সুকোমল হৃদয় চিনেছি। সে যে একেবারে প্রভাত পুষ্পেরমতই শুভ্র সুরভিনিন্দিত। আমি তোমার মনোদর্পণের মত ওই দুটি স্বচ্ছ চোখে তোমার পবিত্র চিত্ততা শতবার সহস্র বারই যে পাঠ করেছি—আমি তোমার অসীম স্নেহ প্রেম করুণা আজও ওই ব্যথিত মুখে মাখান দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, এততেও যদি তোমায় না চিন্বো তবে এতদিন, তোমার সঙ্গে এক গৃহে বাসই যে আমার পক্ষে ব্যর্থ হলো জুলিয়েট্! শোন জুলিয়েট্! আমায় দোষ দিও না; আমি স্বেচ্ছায় জেনেশুনে তোমায় ভালবাসিনি। জানিনা কবে কোন্ দেবতা আমার নিজেরও অজ্ঞাতসারে আমায় একেবারে তোমার ওই করুণ দৃষ্টির উপরেই সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে দিয়েছেন। না’হলে দিকে দিকে আজ ওই মৃত্যুর ভেরী বেজে উঠ্‌চে আর আজ আমি একজন যোদ্ধা আমি-দুর্দ্দম নাগরিকদের নেতা, আমি,—আমি কি না একটা অসহায় শিশুর মত তোমার পায়ের তলায় সর্ব্বস্ব অঞ্জলী দিতে এসেছি। শুধু শুধু কি এমন হয় জুলিয়েট? আমি দেবীর নিকট ভিক্ষা চাইতে এসেছিলাম। আমার স্বর্গীয় প্রেম, আমার দেবদত্ত ভালবাসা সে যে পায়ে স্থান দিয়েছে এত বড় সৌভাগ্য আমার, এও আমি বুঝ্বো না? আমি বুঝেছি—জুলিয়েট্—সাধনা আমার,—দেবী আমার,—সর্ব্বস্ব আমার—আমি বুঝেছি!

ডিরোলেড দুই হাতে জোর করিয়া তাহার অনিচ্ছুক হস্ত টানিয়া লইয়া তাহা নিজের আবেগ আনন্দে কম্পিত বক্ষে চাপিয়া ধরিল, তারপর পুনঃ পুনঃ সেই ক্ষুদ্র হাত খানির উপর তৃষিত অধর চাপিয়া তাহাতে অজস্র চুম্বন রেখা আঁকিয়া দিল। সেই সরল চিত্ত বীরের গভীর চিত্তোদ্বেগের সকরুণ সাক্ষ্যস্বরূপ অজস্র অশ্রুবিন্দুও সেই প্রথম প্রণয় নিদর্শন পবিত্র চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে সেই ফুটন্ত ফুলের মত শুভ্র সুকোমল হাত খানার উপরে ঝরিয়া পড়া শিশির বিন্দুর মতই ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বীরের অশ্রু! সে অশ্রু কি মহৎ! কি করুণ! কি গভীর!

জুলিয়েট্ সেই গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ ঐকান্তিকতার মহাপূজা সহ্য করতে না পারিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। গভীর যন্ত্রণায় আকুল হইয়া উঠিয়া সে ডিরোলেডের হস্ত হইতে আপনাকে ছিন্ন করিয়া লইতে গেল, কিন্তু পারিল না। নিদারুণ মানসিক বেদনায় মর্ম্মের মধ্যে মরিয়া গিয়া, সে তাহার স্রোতস্বিনীর মতই বেগবান ভালবাসার আবেগ ভরা আশা আনন্দের কল্পনা কথা হইতে নিজের কর্ণরুদ্ধ করিতে গেল—কার সুগভীর এই ভালবাসা? যাহার বিশ্বস্ত আতিথেয়তা ভঙ্গ করিয়া সে যাহার পশ্চাতে গুপ্তচরের ন্যায় ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিয়া নিজের প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অনাহারে অনিদ্রায় দিবারাত্র ফিরিয়াছে। এ সেই তাহার তাঁহাদের পরম শত্রু যাহার জন্য সম্ভ্রান্ত বংশের উত্তরাধিকারিণী আজ এই ভিখারিণী বেশে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেও দ্বিধা করেন নাই। এ সেই তাহার হিংসা বৃত্তির একমাত্র লক্ষ, তাহার শত্রু, তাহার পিতার, ভ্রাতার পিতৃবংশের মহাশত্রু! সে তাহাকে গভীর ঘৃণার সহিত কেবলমাত্র তাহার ভাতার হত্যাকারী বলিয়া মনে করিতে গেল। তাহার পিতার অকাল মৃত্যুর হেতু তাহার অদৃষ্টাকার করাল ধূমকেতুমাত্র! আর কেহ না! আর কিছু না! প্রাণপণে সে তাহার ভ্রাতার জীবন শূন্য সেই শোণিতাক্ত হিমশিলা শীতল দেহ মনে করিবার চেষ্টা করিল। পিতার দুর্ব্বল কণ্ঠে কঠিন শেষ আদেশ স্মরণ করিল, "জুলিয়েট্! আমাদের এই শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্যই শুধু বাঁচিবার চেষ্টা করো।"—সেই কণ্ঠকে কানের মধ্যে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য সে প্রাণপণে নিজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু হায় একি! সেই সমস্ত জীবন্ত ছবি আজ, ছায়াবাজির মতই তাহার দৃষ্টিহীন প্রায় চোখের সম্মুখ হইতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অপসৃত হইয়া যাইতে লাগিল এবং তাহার পরিবর্ত্তে সেই স্থানে এই সুদীর্ঘাকৃতি সুন্দর যুবকের তরুণ বীরমূর্ত্তি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার পদ প্রান্তে সেই মূর্ত্তি দীনদরিদ্রের ন্যায় ভূমিতলে নতজানু হইয়া বসিয়া তাহারই হস্তের উপর নিজের উচ্চ পূজ্য সম্মানিত মস্তক রক্ষা করিয়া অশ্রুশিক্ত করিতে করিতে রুদ্ধ কণ্ঠে সকাতরে বলিতেছিল, "আমি তোমায় ভালবাসি জুলিয়েট্! দেবি আমার! স্বর্গ আমার! আমি তোমায় ভালবাসি।" আর তাহার সেই সাধের স্বর্গ সেই কল্পনার দেবী তাহার সঙ্গে ব্যবহার কি করিয়াছে? সে নিজের জীবনকে ঘোর বিপদাপন্ন করিয়াও ছলে কৌশলে তাহার এই নিরুপদ্রুত শান্তিময় গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল —কেন? না, তাহার প্রত্যেক চাল চলনটি অবধি পর্যবেক্ষণ করিতে পাইবে বলিয়া। তার পর, উঃ কি ভয়ানক! তার পরের কথা আর বলিবার কহিবারই নয়। কি হৃদয়হীন সম্প্রদায়ের হস্তেই সে তাহার ভাগ্যফল সঁপিয়া দিয়াছে! যাহারা দয়া কাহাকে বলে তাহার নামও কখন জানে না, সে সমুদয় সে কেন করিয়াছে? শুধু প্রতিহিংসা, শুধু প্রতিহিংসা লইবার জন্য। এই প্রতিহিংসা গ্রহণই কিছুক্ষণ মাত্র পূর্ব্বেও তাহার জীবনের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতম কার্য্য ছিল। কিন্তু আজ যখন ডিরোলেড তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বিদায় চাহিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই সমুদয় ঘৃণা বিদ্বেষ যেন দূরে

সরাইয়া ফেলিয়া গভীর করুণারাশি কোথা হইতে যে উথলিয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহার মধ্য হইতে কতদিনকার সুপ্ত বেদনা সহসা জাগিয়া উঠিয়া নারী হৃদয়ের অজস্র ভালবাসার অমৃত অভিষেকে ব্যাকুল উর্দ্ধস্বরে হাহা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দয়ার যমজ সহোদরা প্রেম সেই শুষ্ক রুদ্ধ কোমলতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া আবার তাহার ঘুমন্ত নারী প্রকৃতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল বুঝি? হায়রে মানবী! কেমন করিয়া তুই নিজের মানবত্বকে চির বিস্মৃত হইয়া রাক্ষসী হইয়াই থাক্বি তবে এখন সে কি করিবে? হয় যদি সে সব কথা ভুলিয়া যাইতে পারিত! যদি সে নিজেকে নীরব নিবেদনে এই সাহসী, উদার, উচ্চহৃদয়, পূর্ণ বিশ্বাসী প্রেমিকের হস্তে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্পণ করিয়া দিতে পারিত! হায়! তা হইলেই তাহার এ ব্যর্থ জীবন বুঝি শুধু সার্থক হইতে পারিত। এখন সে কি করিতে পারে? তাহার এই অবশ হাত দুটি সে কেমন করিয়াই তাঁহার সবল হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া লইবে? কাজে কাজেই কানেও ঐ যে অজস্র প্রণয়স্তুতি প্রবেশ করিতেছে তাহার ঐ ভালবাসার কথা শ্রবণ করা ভিন্ন আরত তার কোনই উপায়ও নাই।

## ৫

“রিপবলিকের নামে শপথ শীঘ্র দ্বার খোল?”

ডিরোলেড মুহূর্ত্ত মধ্যে জুলিয়েটের হাত ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ শব্দ—ইহার অর্থ তাহার ভাল রকমই জানা আছে।

সেই হুমূর্তেই পাশের বারান্দা দিয়া পুরাতন ভৃত্য দ্বার মুক্ত করিবার জন্য দ্রুতপদে বাহিরের দিকে চলিয়া যাইতেছে শব্দ পাওয়া গেল। তাহাকে আর সেই অচলতা হইতে চলিবার তৎক্ষণাৎ আবশ্যক হইল না।

জুলিয়েট ও শিহরিয়া উঠিয়া বিভীষিকাপূর্ণ আতঙ্কে তাহার পদানত প্রেমপত্রের বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া তৎপরে দ্বারের দিকেও চাহিয়া দেখিল। আর এক মুহূর্ত্তপরেই ‘সাধারণের রক্ষাসমিতি’র কর্ম্মচারীগণ এই ঘরে প্রবেশ করিবে, এই সময়ে—এই অমরাবতীসুখস্বপ্ন ভঙ্গ করিতে তাহার নিজের হাতই যে আজ তাহাদের এইখানে ডাকিয়া আনিয়াছে।

ডিরোলেড অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, জালে পতিত সিংহ যেমন অবরুদ্ধ আক্রোশে গুমরিয়া তাহার সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনি করিয়া সে একবার কক্ষ ও কক্ষ-প্রাচীরের চারিদিকে চাহিয়া তারপর উর্দ্ধ আকাশে, কিম্বা নিম্নে নরকে—যেখানে হোক, —যেখানেই হোক, কোথায়ও একটা স্থান অনুসন্ধান করিল যেখানে সে তাহার এই রেশম মণ্ডিত এই মৃত্যুবাণটি সমেত অদৃশ্য হইয়া

যাইতে পারে। কিন্তু সেরূপ কোন উপায়ই গৃহনির্ম্মাতা রাখে নাই। তাই হতাশ চিত্তে সেই নিজের হাতে লেখা নিজের মৃত্যুর পরওয়ানাটা মুঠা দিয়া চাপিয়া ধরিল।—

এই সময়টুকুর ভিতরে বহির্দ্বারের প্রকাণ্ড কপাট ঠেলিয়া খুলিবার সংঘর্ষ শব্দ এবং তাহার পরমুহূর্ত্তেই একসঙ্গে অনেক লোকের পদধ্বনি ও গলার সাড়া বারান্দা দিয়া ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। গভীর নিস্তব্ধ গৃহে সেই ভীষণ চিৎকার ও বিদ্রুপের কঠোর কর্কশ উচ্চ হাস্য ভৌতিক শব্দের মতই নির্দ্দয়তার সহিত পুনঃপুনঃ সজোরে আঘাত করিয়া উঠিতে লাগিল। আর সেই সঙ্গে সে গৃহের দুইটি ভয়বিহ্বল চিত্তকে মুহুর্মুহু বেত্রাঘাতে যেন তাহারা সচেতন করিয়া তুলিল। ডিরোলেডের মুখের দিকে একমাত্র সুগভীর দৃষ্টিপাত করিয়াই জুলিয়েট্ সহসা তাহার হস্ত হইতে তাহার সেই মৃত্যুবাণটাকে টানিয়া লইয়া সোফার উপরে নিক্ষেপ করিয়া নিজে তাহার উপরে চাপিয়া বসিয়া পড়িল।  এক মুহূর্ত্ত পরেই যখন সশব্দে দ্বার খুলিয়া গেল এবং তাহার ভিতর দিয়া মুক্ত জলস্রোতের মত লালটুপি ও ত্রিবর্ণের চিহ্নধারী সশস্ত্র সৈনিকদলের সহিত মারাট সদর্প পদবিক্ষেপে গৃহে প্রবেশ করিলেন তখন, সে মহিমময়ী রাজ্ঞীর মত স্থির অথচ সগর্ব্ব ভঙ্গীতে তাহাদের পানে চাহিয়া কহিল, "সিটিজেন ডিরোলেড! ১৭৯৩ সাল হইতে কি এদেশের ভদ্র লোকেরা নারীর সম্মান শুদ্ধ ভুলিয়া গিয়াছেন না কি? অনায়াসেই তাঁহারা এখন এমন একটা বিশ্রদ্ধালাপ ভঙ্গ করিতে ৭ সাহস করেন। এ বড়ই আশ্চর্য্য!"

রিপব্লিকদিগের তীক্ষ্ণ সুচতুর দৃষ্টি প্রথমে তাহাদের, তার পর সেই ঘরের ছাদ দেওয়াল ও সমুদায় আসবাব পত্রের উপরে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। একটু উপহাসের তীক্ষ্ণ হাসিখানি ক্ষুরধারের মতই মারাটের নিশাচর জাতীয় জীব বিশেষের ন্যায় পরম গম্ভীর মুখে চকিত হইয়া উঠিল। ডিরোলেড তাহার স্বাভাবিক স্থৈর্য্যাবলম্বনের চেষ্টা করিতে করিতে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরকম আশ্চর্য্য আগমনের অর্থ কি সিটিজেন মারাট?"  মারাট একটুখানি মাথা নোয়াইয়া বিদ্রুপের ছলে উভয়কেই অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "আপনার বিরুদ্ধে একটা ভয়ানক অভিযোগ আছে, জানিলেন সিটিজেন ডেপুটী! আজ আমাদের সমিতির কাছে এক বেনামী চিঠি পৌঁছেচে যে, আপনি না কি 'বিধবা ক্যারেটে'র সাহায্য করছেন। আর তারি প্রমাণ পত্র সমস্ত আপনার এই ডেক্সেইই না কি পাওয়া যাবে।—কি করি বলুন, সমিতি আমাকেই এই অপ্রিয় অনুসন্ধানের ভারটা চাপিয়ে দিয়াছেন।"

ডিরোলেড, ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন,—আশ্চর্য্য! রিপবলিকের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও তার একটা নামহীন শত্রুর চাতুরীতে এতবড় একটা অপমানের হস্ত হ'তে মুক্ত হ'তে পারে না,—এতই অবিশ্বাস!"

“সমিতি সাধারণের মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ আবদ্ধ, আমরা তাই নিরুপায়।”

মারাট তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু শ্যেনদৃষ্টিতে ডিরোলেডের মুখের উপরে সোজা চাহিয়া কহিতে লাগিল, “কিন্তু সিটিজেন ডেপুটি! আপনার এই সব চাবিবদ্ধ আসবাবের ভিতরে এমন কিছু গোপন রহস্য নাই, যার জন্য আমাদের কর্ত্তব্য সাধনে বাধা দেবার চেষ্টা আপনি করতে পারেন? কি বলেন?”

ডিরোলেড নীরবে এক তোড়া চাবি আনিয়া মারাটের সহকারীর হস্তে প্রদান করিলেন। অনুসন্ধান আরম্ভ হইল।

জুলিয়েটের কি অবস্থা হইয়াছে জানিবার কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিলেও ডিরোলেড এ পর্য্যন্ত একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখে নাই। বিপ্লববাদীগণের মমতাহীন তীব্র দৃষ্টি তাহার মুখের উপরে সমস্তক্ষণ অপলকেই স্থাপিত রহিয়াছে, তাহার নেত্রতারকার এতটুকু স্পন্দনটির উপরে এখন তাঁহার সহিত তাহাকেও, —যাহাকে একদিন এমনি একটা নৃশংস মৃত্যুর হস্ত তাহার পাশে দেবতার নির্ম্মল আশীর্ব্বাদটুকুর মতই আনিয়া দিয়া গিয়াছে—এই মুহূর্ত্তে একই নিষ্ঠুর মরণ পথের সহযাত্রিণী করিয়া দিবে। ডিরোলেডের বক্ষ একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার ভীষণ আনন্দে সঘনে নাচিতে লাগিল। যে মিলন ঈশ্বরের দান, জীবনে কিম্বা মরণেও তা ছিন্ন হইবার নয়। আজ যদি মরিতেই হয় তবে তাহার ওই জীবনের শ্রেষ্ঠতপঃফল হইতে বিচ্যুত হইয়া মরিতে হইবে না। দুই জনেই দুজনের বাহুলগ্ন, বক্ষঃলগ্ন হইয়া পরস্পরের অসীম ভালবাসার অতলে তলাইয়া থাকিয়া একসঙ্গে এক নিমিষে আজ মারতে পারিবেন। সেও কি কম সুখ!

জুলিয়েট্ কিন্তু নিজেকে আশ্চর্য্য স্থির রাখিয়াছিল। তাহার রেশমী পোষাকের কুঞ্চিত প্রান্ত স্তরে স্তরে সোফার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হাতে হাত বদ্ধ করিয়া জগতের সমুদয় ক্ষুদ্র প্রাণী ও তাহাদের সমস্ত ক্ষুদ্র কার্য্যকে উদাস দৃষ্টি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করিয়া সে মুকুটপরিত্যক্তা রাজ্ঞীর মত অবিচল মহিমায় নিজ স্থানেই বসিয়াছিল। তাহার সেই সমুদয় কৃত্রিমতা আজ কিসের জন্য? না যে একটিমাত্র চিহ্ন এই মুহূর্ত্তেই তাহার তীব্র ঘৃণার পাত্রকে, তাহার চিরদিনের পরম শত্রুকে গিলোটিনের তলায় টানিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম, সেইটিকে লুকাইয়া রাখিবার জন্য সেই শত্রুর হস্ত তাহার প্রাণাধিক ভ্রাতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছে, পিতাকে অকালে ইহলোক হইতে বিদায় লইতে বাধ্য করিয়াছে; কিন্তু কি অসাধারণ শক্তি সেই সজল কণ্ঠের প্রগাঢ় স্বরে; যে তাহারই একটি কথাতেই চিরদিনের সব সঙ্কল্প কোন্ অতলে তলাইয়া ভাসিয়া গেল!

একি ভুজঙ্গিনীকে বশীভূত করিবার—সিংহীকে জালবদ্ধ করিবার-যাদুকরের অব্যর্থ মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ নাকি?

অনুসন্ধানকারীগণ ডেস্কের প্রত্যেক কাগজখানি পর্য্যন্ত নামাইয়া দেখিল। তারপর ঘরের সমুদয় দ্রব্য তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিয়া তাহারা হতাশ হইল। তখন অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে যাইবার উদ্যোগ করিয়া মারাট ডিরোলেডের পানে ফিরিয়া বিদ্রূপপূর্ণ শ্রদ্ধার ছল করিয়া বলিল, “সিটিজেন গবর্ণর! আমার অনুরোধ, আপনি আমাদের এই দুঃখজনক কর্ত্তব্য সম্পাদনের সময়টা বরাবর আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। তারপর আমি শপথ ক’রে বলচি, খুব শীঘ্রই আপনাদের ‘বিশ্রাব্ধলাপ’ করবার নিরুপদ্রব অবসর দিয়ে আমরা বিদায় নেবো—ঐ বিশ্রাব্ধলাপটা ভঙ্গ করায় সিটিজেনেস্ আমাদের পরে বড়ই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।”

যাহাকে ‘অনুরোধ’ বলা হইল কার্যতঃ তাহা অলত আদেশ! বন্দী যেমন করিয়া প্রহরীগণের সহিত কারাগারের দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়, তেমনি অনিচ্ছুক পদে ডিরোলেড মারাটের সহিত সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। মারাট অন্যান্য স্থানে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া এবার নিশ্চয়ই জুলিয়েট্‌কে উঠিতে আদেশ করিবে। তারপর? ডিরোলেডের নির্ভীক চিত্ত কম্পিত হইতে লাগিল। দুর্ভাগিনী রাণী ও ষড়যন্ত্রকারীগণকে রক্ষা করার পরিবর্ত্তে তাহাদের সহিত এই দেবী প্রতিমাকেও পিশাচের হস্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে হইবে যে!

তাহাদের পদশব্দগুলা একেবারে মিলাইয়া গেলে গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বাক্সটাকে খুব সাবধানেই কাপড়ে ঢাকিয়া লইয়া জুলিয়েট্ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া জানালার নিকট আসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল। হায় কোথায় মুক্তি! ঊর্ণনাভ নিজের জালে নিজেই বিজড়িত! চারিদিকেই অসংখ্য সশস্ত্র প্রহরী।

সশঙ্কচিত্তে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইল।

## ৬

মাদাম ডিরোলেড তাঁহার ঘরে একখানা সোফার উপরে নিঃসহায়ভাবে নিজেকে নিক্ষেপ করিয়া হতাশাস্ফীত সভয় দৃষ্টিতে দ্বারের নিকটবর্ত্তী প্রহরী দুইটীর পানে চাহিতেছিলেন। জুলিয়েট্ কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র একটুখানি

উৎসাহিত হইয়া মনের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া উঠিলেন, "দেখ দেখি জুল্, এ কি রকম অন্যায়! ফ্রাঙ্কের এতটা উন্নতি অনেক লোকেরই চক্ষুশূল হয়েছে কিনা, তাতেই কেউ তাকে অপদস্থ কর্ব্বার জন্যে এই রকমটা করেছে, আর কি? তা হোক্ ঈশ্বরতো এখনও আছেন, নিশ্চয়ই শেষটায় সব মিটে যাবে। দেখো তুমি, নির্দ্দোষী নিরপরাধী যে, সে কেন কষ্ট পাবে, আহা তুমিও বাছা যেন শুকিয়ে উঠেছ। বসো মা বসো।" জুলিয়েট্ কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু তাহার দারুণ মনোদ্বেগে কম্পিত ওষ্ঠ শব্দ উচ্চারণ করিতে সক্ষম হইল না, একটু খানি নড়িল মাত্র।

এমন সময় ডিরোলেড সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া মাতাকে উদ্দেশ করিয়া সোৎসাহে কহিয়া উঠিলেন, "সিটিজেন, মারাট এইবার সদলবলে ফিরে যাবার বন্দোবস্ত কর্‌চেন, আমার জন্যে আর তোমার ভয় করার কোন কারণ নেই মা। কে, জুলি-মাদ্‌ময়সেল, ক্ষমা করো—আমি তোমায় দেখতে পাইনি। উ: তোমাকেও আমাদের সঙ্গে থেকে এই অপমানটার অংশ নিতে হওয়ায়, কি রকমই ক্লান্ত ক'রে ফেলেছে। যাহোক এখনি বিশ্রাম করতে পাওয়া যাবে—এই যা সুখের বিষয়!"

দুইজন প্রহরীর সহিত তাহাদের নায়ক মারাট গৃহে প্রবেশ করিয়া সসম্ভ্রমে বৃদ্ধা ব্যারনেসকে অভিবাদন করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, "আপনাদের অনর্থক কষ্ট দিতে বাধ্য হওয়ায় বড়ই দুঃখিত হচ্চি সিটিজেনেস্! কি করি বলুন, এখনকার সময়ে সামান্য কারণেও একটু বেশি বিচলিত হ'তে হয়।"

ডিরোলেডের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"তবে এখন বিদায় সিটিজেন ডেপুটি! আপনি নির্ব্বিঘ্নে আপনার সম্মানিত নূতন পদ গ্রহণ করিতে যান্। বোধ হয় আপনার কোন গুপ্তশত্রুই আমাদের কাছে এই চিঠি পাঠিয়েছিল। এই দেখুন না, হয়ত এ লেখা আপনার অচেনা না-ওতো হ'তে পারে। গুপ্তশত্রুকে চিনে রাখা ভাল। জ্যাক্ কস্তেঁগো—চলো আমরা আর বিলম্ব ক'রে এই লেডির নিকটে নিজেদের অভিশপ্ত কর্ব্বো না।"—এই বলিয়া তিনি ডিরোলেডের সাগ্রহ প্রসারিত হস্তে একখানি পত্র দিতে গেলেন; এই সময় অকস্মাৎ মর্ম্মবিদারক আর্ত্তনাদের সহিত নিস্পন্দপ্রায় জুলিয়েট্ ছুটিয়া আসিয়া বিদ্যুতের মতই ক্ষিপ্রহস্তে সেই চিঠিখানা কাড়িয়া লইয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"না না ডিরোলেড্ ডিরোলেড, —না না ও চিঠি তুমি দেখো —দেখো না।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে শতখণ্ডে পত্রখানা সে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া পায়ের তলায় ফেলিয়া তাহা চরণ-মর্দ্দিত করিতে লাগিল। তাহার যেন তখন খুন চাপিয়াছিল এমনি উন্মাদিনীরই মত মুখ চখের ধরণ।

এই আকস্মিক উল্কাপাতের পর সে ঘরের লোকেদের ভিতর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ একটি শব্দও উচ্চারণ করিতে পারিল না। সহসা নির্ম্মেঘ আকাশ হইতে বিচিত্রবর্ণে-রঞ্জিত ওই ছাদটা ফুটা করিয়া যদি শতবজ্র এক সঙ্গে সেই ঘরের মধ্যে নামিয়া আসিত, তাহা হইলেও বোধ করি সে ঘরের লোকেরা ইহাপেক্ষা অধিকতর স্তম্ভিত হইত না। কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেও পারিতেছিল না, কেবল মারাট একবার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের ক্রুহাস্যে নবীন গভর্ণরের সর্পদষ্টবৎনীলিমালিপ্ত বিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সে মুখে গভীর হতাশাপেক্ষাও বিস্ময়ের বিমুঢ়ভাব অতি সুস্পষ্ট অক্ষরে প্রশস্ত উদার ললাটে রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মারাট বিজয়ের উৎসাহানন্দপরিপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ পত্র তবে আপনিই লিখেছেন ব’লে স্বীকার কর্‌চেন?”

জুলিয়েট কাতরনেত্রে ডিরোলেডের পাষাণ মূর্ত্তির প্রতি একবার মাত্রই ফিরিয়া দেখিল, তারপর আর্তকণ্ঠে কহিল, “হ্যাঁ আমিই লিখেছি।”

বাধা দিয়া উচ্চ কণ্ঠে তিরস্কারপূর্ণ কাতরস্বরে বৃদ্ধা ব্যারনেস মাদাম ডিরোলেড কহিয়া উঠিলেন, “নির্ব্বোধ মেয়ে! কি তুমি অবুঝের মত কথাবার্ত্তা কইচো! তুমি কিসের জন্য এই ভয়ানক চিঠি লিখ্‌তে যাবে? মহাশয়! আমার ছেলের বিপদ আশঙ্কায় ওর সব বুদ্ধি শুদ্ধিই লোপ পেয়ে গ্যাছে। দেখছেন না এরকম কখনও কি হ’তে পারে, আপনিই বলুন না-পারে কি? মারাট নীরবে ডিরোলেডের মুখের দিকে চাহিলেন। সেই পাষাণমুর্ত্তি প্রাণহীনের মতই স্তব্ধ, তেমনি অবিচল। তখন তিনি অপরাধনীর দিকে ফিরিয়া সেই মর্দ্দিত পত্রখানার একটি টুকরা কুড়াইয়া লইয়া তাহা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ লেখা আপনার?” জুলিয়েট্‌ মৃদুস্বরে উত্তর করিল, “হাঁ। আমারই।”

“এ রকম লেখবার কিছু যথার্থ কারণ আছে?”

“আছে।”

মারাট সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন “কি?”

এবার জুলিয়েট তাহার সুনীল স্বচ্ছ নেত্রদ্বয় মারাটের মুখের উপরে নির্ভীকভাবে স্থাপন করিয়া অকম্পিতস্বরে উত্তর করিল, “এখন বলবো না, বিচারালয়েই সমস্ত বল্বো।”

“বেশ সেই ভাল। এই ভদ্রলোক তবে সম্পূর্ণ নিরপরাধী?

মৃদু হাসিয়া জুলিয়েট্ কহিল "স্বচক্ষে দেখতেই তো পেলেন।"

মারাট খুসী হইয়া ডিরোলেডের নিকটে আসিয়া কহিলেন, "আপনাকে অনর্থক এমন ভীষণ সন্দেহ করবার জন্য আমাদের ক্ষমা করবেন সিটিজেন্ গবর্ণর! কিন্তু আপনি একবার সিটিজেন্ মিরাবোঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, তবে কারজারিতে নিশ্চিন্তচিত্তে যাত্রা কর্বেন!—এ কি লেডি! এতক্ষণতো আপনাকে বেশ সহসীর মতই দেখাচ্ছিল, এখন এত কাঁপছেন কেন? দুর্ভাগ্যক্রমে আপনিই আপনার সেই ঈপ্সিত বিশ্রদ্ধালাপের অবসরটুকু নষ্ট ক'রে ফেলেন। আমার এতে কোন দোষ নেই!—ও কি, ওই না সেই খাম; যা খুঁজতে আমি এতদূরে এসেছিলুম, —বাঃ বাঃ রহস্যটা ক্রমেই যে রীতিমত বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখ্‌চি।"

জুলিয়েটের কম্পিত শিথিল বাম হস্ত কোন্ সময় এই ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, সে তাহা জানিতেও পারে নাই। মারাট মুহূর্ত্তে সেই সংহারাস্ত্র,অভাগিনী রাজ্ঞীর ভাগ্যলিপি উঠাইয়া লইয়া উচ্চৈঃস্বরে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিলেন, কহিলেন—"এই রকম একটা ষড়যন্ত্রের অস্পষ্ট গুজব আমরাও শুনেছিলুম, কিছুতেই কিন্তু এর কোন কিনারা পাইনি। বড় উপকৃত হলেম,—ম্যাদ্‌ময়সেল্। আপনার নিকট আমরা বড়ই উপকৃত হলেম। বলুন দেখি, এখন এটি কোথায় আপনি পেলেন? আপনাকে সত্যবাদী বলেই আমার খুব বিশ্বাস হ'চ্চে।"

বৃদ্ধা বিদ্যুৎচমকে চমকিয়া উঠিয়া বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার, পাণ্ডু মুখে আশাহীন ঘোর যন্ত্রণার চিহ্ন সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিল। জুলিয়েট্ কোনই উত্তর না দিয়া নত মুখে যেমন তেমনই দাঁড়াইয়া, রহিল।

সমস্ত বিশ্বজগৎ তখন ডিরোলেডের নিকটে ধূমায়মান হইয়া গিয়াছে, জীবন অথবা সম্মান কিছুই যে আর তাঁহার এ পৃথিবীতে আবশ্যক আছে কিম্বা ইহাদের কোন মূল্যই আছে, একথা পর্য্যন্ত তাঁহার মনেও ছিল না। তাঁহার উপাস্য দেবতা যে আজ বড় সহসাই পিশাচে পরিণত হইয়া গিয়াছে! দেবীর মণ্ডপে তাই আজ হু হু শব্দে নরকাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মারাট পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে এই জিনিষটার প্রকৃত অধিকারী? শীঘ্র বলে।"

জুলিয়েট্ এইবার চেষ্টা যত্নে যতদূর সম্ভব নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়াছিল। সে গ্রীবা উন্নত করিয়া সগর্বে উত্তর করিল, "চাক্ষুষের চেয়ে কোন বড় প্রমাণ আছে? আমিই ইহার অধিকারী।"

"আর কেউ এ বিষয় জানে?"

"এখানের কেউ না, যারা জানে তাদের নাম আমি বলবো না।"

"উত্তম! সিটিজেন্ ডেপুটি! আপনার অনর্থক বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। প্রহরী! তোমরা উঁহার সঙ্গে যাও। আমিও আর বিলম্ব করতে পারি না।"

সঙ্কেত বুঝিয়া ডিরোলেড, একবার মাতার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। বৃদ্ধা উন্মাদিনীর মত আসন হইতে উঠিয়া ছুটিয়া আসিয়া পুত্রকে জড়াইয়া ধরিলেন, "ফ্র্যাঙ্ক, ফ্র্যাঙ্ক! বাবা আমার। আমার সর্ব্বস্বধন! ঘরের মধ্যে কালসাপিনীকে আমাদের দুজনকার বুকের রক্ত দিয়ে আমরা যে পুষ্ছিলুম—ওরে বাছা সে কি তোকেই দংশন কর্ব্বে ব'লে রে!"

ডিরোলেড মাতার স্নেহবাহুপাশ হইতে ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া তাঁহাকে নীরবে চুম্বন করিয়া প্রহরীদ্বয়ের সহিত নিঃশব্দে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় একবার জুলিয়েটের দিকে সে অপাঙ্গেও চাহিল না। তাহার জীবনের গ্রন্থিবন্ধন পর্য্যন্ত যে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে!

## ৭

ডিরোলেডের পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল, বৃদ্ধা নিজের আসনে আবার বসিয়া পড়িয়া দুই করে মুখ ঢাকিলেন। নিস্তব্ধ গৃহে তাঁহার ঘন ঘন নিশ্বাসের মর্ম্মভেদী শব্দ মর্ম্মভেদী বিলাপধ্বনির মতই শুনাইতে লাগিল। মারাট জুলিয়েট্‌কে কহিলেন, "আমিআর বিলম্ব কর্‌তে পারব না?"

হাতে হাত সংবদ্ধ করিয়া সেই যুক্ত কর দ্বারা নিজের ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রবৎ উদ্বেল বক্ষকে চাপিয়া ধরিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল, নতনেত্র তুলিয়া মৃদু হাসিল,—"না আর বিলম্ব কি? কেবল একটা অনুরোধ"—মারাটের কঠোর দৃষ্টি সহসা ঈষৎ স্নেহপূর্ণ হইয়া আসিল—"কি?"

মৃদুস্বরে জুলিয়েট্ কহিল, "দু একটি কথা আমি গোপনে মাদাম ডিরোলেডকে ব'লে যেতে চাই,—পারি কি সিটিজেন্ মারাট?"

ইচ্ছা সত্ত্বেও কঠিন চিত্ত মারাট, ইহাকে 'না' বলিতে পারিল না। জুলিয়েট তখন ধীরে ধীরে মাদাম ডিরোলেডের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মাদাম ডিরোলেড তাহা জানিতে পারিয়াও তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন না। ধ্যানমগ্নের ন্যায় নিঃস্তব্ধ হইয়া তিনি অন্যদিকেই চাহিয়া রহিলেন। জুলিয়েট্ তাঁহার পায়ের কাছে জানু নত করিয়া ভূমে বসিয়া পড়িল, তাঁহার শোক ও বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে নিজের স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অন্যের অশ্রাব্য মৃদুস্বরে কহিল, "আমায়

আপনারা ঘৃণা কর্‌তে পারেন মাদাম! আপনার এ গৃহ আমার দ্বারা কলুষিত হচ্চে তাও আমি জানি, আমি আর বেশীক্ষণ দেরী ক'রে এ পাপের ভার বাড়াবো না। —তবে একটি অনুরোধ আমার আছে, তাই বলতেই এসেছি,—শেষ অনুরোধ শুন্বেন না কি?"

মাদাম ডিরোলেড নিস্পন্দ বসিয়া রহিলেন, ফিরিলেনও না। অব্যক্ত যন্ত্রণাপরিপূর্ণ দীর্ঘশ্বাসে জুলিয়েটের বক্ষ তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রেরই ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। একটুখানি নীরবে থাকিয়া উত্তর পাইবে না বুঝিয়া সে তখন আবার কহিল, "আমার এই শেষ অনুরোধ— যখন সংবাদ পাবেন যে, বিশ্বাসঘাতিনীর পাপ দেহ তপ্ত শোণিতধারায় ধুয়ে গিয়ে তার নিদারুণ রক্তপিপাসা মিটিয়ে দিয়েছে, তখন শুধু কৃপা ক'রে এই কথাগুলি তাঁকে বল্বেন—এই আমার একমাত্র শেষ প্রার্থনা!—বল্বেন আমি তাঁর ঘরের এই বিশ্বাসহন্ত্রী অতিথি, জুলিয়েট্ মার্ণি, ৺কাঁউন্ট্ মার্ণির কন্যা। তিনি বোধ হয় ভুলে যান নি, তিনি আমার ভ্রাতৃহন্তা! ভাইয়ের মৃত্যুশয্যায় পিতার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম—মৃত ভাইকে ছুঁয়ে শপথ করেছিলেম,—তাঁর পুত্রহন্তা এর প্রতিফল পাবে! তাই নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে এখানে স্বেচ্ছায় এসে ঢুকেছিলেম—অকস্মাৎ নয়। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যই আপনাদের আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়েছিলুম।

জুলিয়েট্ একটু থামিল, তারপর রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ পরিস্কার করিয়া লইয়া পুনশ্চ কহিল, "তারপর আরো বল্বেন যে, প্রতিহিংসা ভিন্ন ইহলোকে পরলোকে আর কোন ধর্ম্ম, কোন কার্য্য জীবনের উদ্দেশ্যই ছিল না; হাতে পেয়ে তা কেন আমি পূর্ণ করিনি? এর উত্তর দেওয়া ভাইকাউন্ট রাল্‌ফের ভগ্নী ও কাউণ্ট মার্ণির মেয়ের পক্ষে অপমানজনক হলেও, কোন রমণীর পক্ষে এতে অপমান নাই! আজ সন্ধ্যাবেলা তাঁরই মুখের শুধু দুটি কথায় আমার সকল সঙ্কল্প, সব চেষ্টা ভেসে গিয়েছে! তিনি বলেছিলেন 'জুলিয়েট্ আমি তোমায় ভালবাসি!' সেই শব্দটুকু আমার কর্ত্তব্য, প্রতিজ্ঞা সবই আমায় ভুলিয়ে দিয়েছে! স্বর্গীয় সঙ্গীতের মত সেই কথাদুটি মৃত্যুর বিভীষিকাকেও মুক্তির আনন্দরূপে আমায় প্রলোভিত করচে। আজ শুধু সেই-ই আমাকে তাঁর যায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁর বিপদকে নিজের মাথায় তুলে নিতে অলঙ্ঘ্য আদেশ দিয়েছিল। তাঁকে আড়াল ক'রে এই যে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে পার্‌লেন এ শুধু তাঁরই সেই মন্মোহনমন্ত্রের গুণ; আমার নয়! সেই সময়েই আমিও বুঝিতে পেরেছিলেম, আমিও তাঁকে ভালবাসি। আমার এই প্রতিশোধ স্পৃহার চেয়েও অধিকতর ভালবাসি।"—

জুলিয়েট্ উঠিয়া দাঁড়াইল, মুহূর্ত্তে মাদাম ডিরোলেড দুই বাহু তাহার দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন, "জুলি! জুলি! বাছা আমার, কোথা যাস্? আমার যে বড় সাধ ছিল।"—

জুলিয়েট্ তাঁহার স্পর্শ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমায় স্পর্শ করবেন না মা,—আমি আপনার স্নেহের যোগ্যা নই। তবে যদি নিতান্তই দয়া করেন, তো আমার মৃত্যুর পর তাঁর মন থেকে আমার প্রতি—পারেন তো এ নিদারুণ ঘৃণা মুছে দেবার একটু চেষ্টাও কর্ব্বেন। বল্বেন "জুলিয়েট্ তার প্রাণাধিক প্রিয় ভাই এর, তার পরমপূজ্য বাপের কাছে মহাপরাধে অপরাধিনী; কিন্তু তাঁর কাছে নয়।—যাই মা, এইবার আমার সকলকার কাছের সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে চল্লেম্। বিদায়!"

সুদৃঢ় পদক্ষেপে মারটের নিকটে আসিয়া বলিল, "আপনাকে, অনেকক্ষণ আটক ক'রে, রেখেছি ব'লে, দুঃখিত হচ্চি, মুসো মারাট! চলুন, এইবার আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন চলুন!"

মারাট এতক্ষণ নীরবে তাহারই ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তাহার সুন্দর সমুন্নত দেহ, সম্রাজ্ঞীর মত নির্ভীক চালচলন ও আত্মগরিমা দেখিয়া তিনি মনে মনে বিস্ময় অনুভব করিতে লাগিলেন। নিষ্ঠুর-প্রকৃতি রিপব্‌লিক-কর্ম্মচারীর পাষাণ চিত্তও ইহাতে যেন দ্রব হইয়া আসিয়াছিল। মনে মনে তারিফ্ করিয়া বলিলেন, "অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিজ্ঞ ও নিরীহ লোকের শোণিত ধারায় রঞ্জিত হ"লেও গিলোটিনের ভাগ্যে এমন একটী মস্তক ইহার পূর্ব্বে জুটে নাই। আমি তাকে ফ্রান্সের একটি অমূল্য দ্রব্য এবার উপহার দিতে পারব।"

জুলিয়েটের আবাহনে মারাট সচকিতে চাহিয়া দেখিয়া, উঠিয়া দাড়াইলেন —"প্রস্তুত?"

"সম্পূর্ণ। আসুন!"

অকম্পিত দৃঢ়পদে জুলিয়েট্ অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া দ্বার সমীপস্থ প্রহরীর দিকে নিজের সুকোমল শুভ্র হাত দুখানি বাড়াইয়া দিয়া নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হাতকড়ি কার কাছে?

মারাট্ প্রশংসমান নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া সম্ভ্রমের সহিত কহিল, "কোন প্রয়োজন নাই, আপনি আসুন।"

বহির্দ্বারের প্রকাণ্ড লৌহ কবাট ঝন্ ঝন্ ধ্বনি সহকারে সজোরে রুদ্ধ হইবার শব্দ প্রকাণ্ড জনহীন পুরীর মধ্যে বহুক্ষণ ধরিয়া প্রতিধ্বনি জাগাইয়া রাখিল। তারপর—তারপর মৃত্যু-গভীর নিঃস্তব্ধতায় সে ধ্বনি মিলাইয়া গিয়া প্রেত-পুরীর ন্যায় সব নীরব হইয়া গেল।

# অযাচিত

## ১

“শুধু সেই জন্য তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও না, না আর কিছু কারণ আছে?” জমিদার হৃদয়নাথ একটু উত্তেজিত ভাবে এই প্রশ্ন করিয়া ব্যগ্রভাবে অদূরবর্ত্তিনী প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ স্থির রমণীর পানে চাহিলেন। পার্শ্বস্থ ঝোপওয়ালা ঝাঁটী গাছটীর উপর সে বাম হস্তের ফুলের সাজিটি রাখিয়া লজ্জা ও বিষাদে চক্ষু নত করিল, উত্তর দিল না। হৃদয়নাথ নিকটবর্ত্তী একটা মাধবী লতার ফুল ছিঁড়িয়া আবার প্রশ্ন করিলেন, “ভয় করবার দরকার নাই, সুমিত্রা, আমাদের মধ্যেকার অবস্থার ব্যবধান ভুলে যাও। আমি জোর ক’রে তোমায় আমার স্ত্রী কর্‌তে চাই না, তা তুমি দেখ্‌তেই পাচ্ছ। সে ইচ্ছা থাকলে তোমার বাবাকে বল্‌তে পারতুম। আমি জানি, আমি দেখিতে সুন্দর নই,— শুধু তাই নয়, বরং দেখিতে কুৎসিতই। কোন সুন্দরী স্ত্রীলোকের পক্ষে আমায় পছন্দ করা সম্ভব নয়। সেই জন্য এতদিন সে চেষ্টা করিওনি। কে জানে যাহাকে বিয়ে কর্ব্ব, সে আমায় পচ্ছন্দ করিবে কি না; কিন্তু এখন যেন এ নিঃসঙ্গ জীবন ক্রমেই অসহ হয়ে উঠেছে।”

সুমিত্রা ঈষৎ ভীতভাবে মুখ নত করিয়াই ধীরে ধীরে বলিল, “কিন্তু সে ব্যবধান যে ভোলবার নয়! আমি আপনার এক জনগরীব প্রজার মেয়ে, লোকে আপনাকে কি বল্বে?”

হৃদয়নাথ ঈষৎ হাসিয়া প্রসন্নমুখে বলিয়া উঠিলেন, “শুধু এই যদি তোমার আপত্তির কারণ হয়, তা’হলে তুমি সে ভয় করো না, লোকে হৃদয়নাথকে চেনে। এখন আমায় বল সুমিত্রা, আমি তোমায় আমার ভাবী পত্নী ব’লে আশা কর্‌তে পারি কি না? ‘না’ বলো না সুমিত্রা, আমার আশা ভঙ্গ করো না।”

সুমিত্রা কম্পিত হস্তে সাজিটা তুলিয়া লইয়া এক বার চকিতমাত্র প্রস্তাবকারীর মুখের পানে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, “আচ্ছা।”

জমিদার হৃদয়নাথ এবার গ্রীষ্মের সময় তাঁহার পল্লীভবনে আসিয়া অবধি এই যুবতী কুমারীটিকে প্রত্যহ তাঁহাদের বাটীর সহিত সংলগ্ন নবসংস্থাপিত ক্ষুদ্র স্কুলগৃহের বাগানের পাশ দিয়া গমনাগমন করিতে দেখিতেছিলেন। প্রথম দুই চারি দিন তিনি নব প্রণালীতে পরা মোটা সাড়ির লম্বিত অঞ্চলখানি দূর হইতে দেখিতে পাইলেই সসম্ভ্রমে সরিয়া যাইতেন—একটা ক্ষণিক দৃষ্টি দ্বারাও ছায়াপাত করিতে শঙ্কা ও লজ্জা বোধ করিতেন। তথাপি এই দূর পল্লীগ্রামের মধ্যে এইরূপ সঙ্কোচহীন আত্মনির্ভরতার একটা মহৎ দৃষ্টান্ত তাঁহাকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তুলিতেছিল।

ক্রমে কৌতূহল লজ্জাকে জয় করিতে লাগিল। হৃদয়নাথ একদিন স্কুল পরিদর্শনে গিয়া বর্ষীয়সী প্রধান শিক্ষয়িত্রীর অন্তর্বর্ত্তিনী দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী বিশ্বাসকুমারীর সঙ্গে পরিচিত হইয়া আসিলেন। সে পরিচয়ে সুমিত্রা তাঁহার সহৃদয়তা ও হৃদয়নাথ বিশ্বাস-কুমারীর ভক্তি ও সম্ভ্রম লাভ করিলেন।

ইহার পর হইতে হৃদয়নাথ স্কুলটীর উন্নতি-বিধানে অত্যন্ত মনোযোগী হইলেন। সর্ব্বদাই তিনি স্কুলগৃহে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন ও অবশেষে একদিন স্কুলের ফেরত, সুমিত্রা যখন তাঁহার নির্জ্জন বাগানে সাজি ভরিয়া ফুল তুলিতেছিল, সেই সময় সহসা সে তাহাদের জমিদারের আকস্মিক আগমনে লজ্জিত ও ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিতে গিয়া বাধা প্রাপ্ত হইল। হৃদয়নাথ দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আমার বাগানের ফুল যদি তাদের সৌভাগ্যক্রমে তোমার হাতের স্পর্শলাভে গর্ব্বিত হয়েছিল, সেটুকু থেকে কি আমার দোষে তারা বঞ্চিত হবে?" তারপর লজ্জাকুণ্ঠিত। সুমিত্রা আকাশ-কুসুমের মত অসম্ভব প্রস্তাব শুনিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল।

দরিদ্র হরিহর বিশ্বাস যখন তাহার বৃদ্ধা জননীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে এক দরিদ্রতর ভদ্রলোকের কন্যাকে তাঁহার পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার পরোপকারিতার পরিচয় দান করে, তখন সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, সেই বিবাহবন্ধন তাহার গলবন্ধন-রজ্জু হইয়া শীঘ্রই তাহার কণ্ঠকে নির্দ্দয়রূপে চাপিয়া ধরিবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ হতভাগ্যের মত সেও ভবিষ্যৎ আশার কুহকে ভুলিয়া, দারিদ্র্য-পীড়িত গৃহে গৃহলক্ষ্মী বরণ করিয়া তুলিবার পরিবর্ত্তে অলক্ষ্মীরূপিণী দারিদ্র্যকেই আবাহন করিয়া বসিল। জমীদারের স্কুলে থার্ডক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়া সে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনটাকে রাজধানীর কোন এক অপরিচিত ক্ষুদ্র মেসের মধ্য দিয়া সাধারণের প্রশংসা দৃষ্টির সম্মুখে পরিচিত করিয়া তুলিবার যে সুদূর কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা এই গলরজ্জু-বন্ধনের প্রথম ফল ফলিতেই ঘুরিয়া গেল। চারিটি প্রাণীর আহার যোগাইয়া কলিকাতায় গিয়া পড়াশুনা করা সম্ভব নয়। অনেক চেষ্টার পর হরিহর জমিদার সেরেস্তায় একটী

২০ টাকা মাহিনার কাজ পাইল। তাঁহার উন্নতি ও উৎসাহের এইখানেই সমাধি হইয়াছিল।

## ২

ইহার পর প্রতি বৎসর একটী প্রাণীকে তাহাদের হ্রসমান আহার্য্যের অংশ-প্রদান, এবং দুর্ব্বল ও রুগ্ন বালকবালিকাগুলির রোগশয্যা পার্শ্বে বিনিদ্র রাত্রিযপনান্তে ভোরের আলোয় দুখানি বাসি রুটী দ্বারা রোগজীর্ণ পাকযন্ত্রের অত্যল্প অভাব ঘুচাইয়া ছিন্ন পাদুকযুগলের মধ্যে ভারবহনে অসম্মত পদদ্বয় জোর করিয়া প্রবেশ করাইয়া, তালি দেওয়া পুরাণ কালের ছাতাখানি ঘাড়ে করিয়া—শ্লথগতিতে জমিদারী কাছারী উদ্দেশে গমন ভিন্ন তাহার জীবনে স্মরণীয় কিছুই ঘটে নাই। কেবল মাত্র এক বার কলেরায় ও একবার ম্যালেরিয়ায় তাহাদের দুঃখ-জীবনের অংশ, দুইটা সন্তানকে পথ্য ও চিকিৎসার অভাবে হারাইয়া তাহার অকালপক্ক কেশ ও শ্মশ্রু অধিক পরিমাণে শুভ্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার ম্যালেরিয়াক্রান্ত পত্নী সেই সময় হইতে তীব্র শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রায় শয্যাগত হইয়াছেন।

হরিহরের অনেকগুলি পুত্রকন্যার মধ্যে সুমিত্রা ও কল্যাণী সকলের বড়। সুমিত্রা ও কল্যাণী এতদিন কলিকাতায় তাহাদের মাসীর বাড়ীতেই থাকিত। মাসীর অবস্থা তাহাদের চেয়ে অনেক ভাল ছিল এবং তিনি বোনের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সুস্থ ও সুন্দর বলিয়া এই দুইটীকেই বেশী ভালবাসিতেন। মাসীর মেয়েদের সহিত স্কুলে গিয়া তাহারা কিছু লেখাপড়াও শিখিয়াছিল। মাসী সুমিত্রার জন্য একটা মেডিকেল কলেজের ছাত্রকে পাত্র স্থির করিয়াছিলেন। প্রভাস সুমিত্রার মাসীর বাড়ীতে থাকিয়া কলেজে পড়িত। তাহার অবস্থাও তেমন ভাল ছিল না, কিন্তু তাহার উদ্যমপূর্ণ হৃদয়ে ভবিষ্যতের যে আশা সঞ্চিত ছিল, কলেজের অধ্যক্ষগণ তাহার পোষকতাই করিতেন। মাসী তাহার শেষ পরীক্ষার দিন গণিতেছিলেন, সুমিত্রা তাহার শান্ত হৃদয়ের মধ্যে একটা উজ্জ্বল সুখের চিত্র নীরবে অঙ্কিত করিয়া তুলিতেছিল। এমন সময় তাহাদের সংসারে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল।

সুমিত্রার স্নেহময়ী মাসীমা হঠাৎ একদিন প্লেগে মারা গেলেন। ওদিকে তাহার মা শয্যাগত, সংসারের সমুদয় ভার ঘাড়ে লইয়া পিতা হাবুডুবু খাইতেছেন। সুমিত্রা ও কল্যাণী বাড়ী ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সংসার এদিকে অচলপ্রায়। বৃদ্ধ পিতার জীবনের বিন্দু বিন্দু ক্ষয় করা ঐ কুড়িটা টাকা ঘরের দ্বার হইতেই পাওনাদারের বাড়ী চলিয়া যায়; সমুদয় মাসটা বুভুক্ষা ও অভাব মুখব্যাদান করিয়া প্রত্যেক প্রাণীটিকে গ্রাস করিতে আইসে। সকলের নিন্দা ভর্ৎসনা অগ্রাহ্য করিয়া সুমিত্রা

নূতন স্থাপিত বালিকা-পাঠশালায় শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করিল। প্রথম লোকনিন্দায় উত্ত্যক্ত হইয়া হরিহর সুমিত্রার এ স্বাবলম্বন বৃত্তি গ্রহণে আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু শেষে মাসিক পনেরো টাকার লোভ ত্যাগ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ কল্যাণী যখন তাহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক ললাট কুঞ্চিত করিয়া উজ্জ্বল চক্ষে তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, “যারা নিন্দে কর্‌ছিল তারা কি আমাদের বিপদের দিনে এতটুকু সাহায্য করেছিল, বাবা?” তখন হরিহর চক্ষু পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন “তোরাই আমার ছেলে। মা, ধর্ম্ম আর এই বৃদ্ধ পিতাকে সর্ব্বদা স্মরণ রেখে কর্ত্তব্য ক’রে যাও, ভগবানের অভিশাপ আমার সঙ্গেই থাকবে, তোমাদের স্পর্শ কর্ব্বে না, তিনি কর্ত্তব্যের পুরস্কার দিতে জানেন।” একে আইবুড়া হাতীর মত মেয়ে দেখিয়াই গ্রামের লোক আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর সেই ধেড়ে মেয়ে যখন গুরুমা সাজিল, তখন আর তাহারা বিস্ময় ও লজ্জা রাখিবার স্থান পাইল না।

## ৩

সে দিন আকস্মিক ভাগ্যপরিবর্ত্তনে বিস্ময়াভিভূতা সুমিত্রা ঘরে ফিরিয়াই তাহার সুখ দুঃখের চিরসঙ্গিনী কল্যাণীকে সকল কথা বলিল। কল্যাণী আরব্য উপন্যাসের গল্প যেমন বিস্ময়ের সহিত দিদির কাছে শুনিত, তেমনই বিস্ময়ের সহিত সকল কথা শুনিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল; কোন মতামতই সে তখন প্রকাশ করিল না। সুমিত্রা বিস্মিত হইল। সে আশা করিতেছিল, আশাতিরিক্ত সুসংবাদ-দানে চঞ্চলা কল্যাণীকে কিরূপ আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত করিয়া তুলিবে। সে হয়ত এই মুহূর্ত্তেই তাহার ভগ্নহৃদয় পিতা মাতাকে এই অপূর্ব্ব সুসংবাদ দিতে ছুটিয়া যাইবে ও মুহূর্ত্তে নিরানন্দ গৃহে আনন্দের উৎস প্রবাহিত করিয়া তাহাকে তাহার কর্ত্তব্যের পুরস্কার দান করিবে। কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। সুমিত্রা ছেঁড়া জামা সেলাই করিতে করিতে দুই একবার বোনের সহসা গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কল্যাণীর গম্ভীর মুখকে সকলেই একটু ভয় করিত। তাই সেও একটু আশ্চর্য্য হইল।

সহসা কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি তা’হলে হৃদয় বাবুকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছ?”

সুমিত্রা ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া নত মুখে উত্তর দিল, “হাঁ। না হয়েই বা কি করি?” “কেন?”

কল্যাণীর গম্ভীর প্রশ্নে সুমিত্রা একটু উত্তেজিত হইয়া কহিল, “কেন, তা আর জিজ্ঞেস করোনা। মার এই এত বড় রোগের চিকিৎসা নাই, বাবার এই অবস্থা,

ভাইবোন গুলির এই দুর্দ্দশা, এই মুহূর্ত্তেই সে সব ঘুচে যাবে জান, তবু জিজ্ঞাসা করচো, কেন?"— কল্যাণী একটু বেদনার সহিত কাপড়ের রিপু করা বন্ধ করিয়া বলিল, "সব সত্যি, কিন্তু তুমি কি সুখী হবে? সেই কথাটা ভাবো।"

সুমিত্রা জোর করিয়া যে ব্যথাটা মন হইতে সরাইয়া ফেলিতেছিল, সেই বেদনাটার উপরই আঘাত পড়িল। তাই বোধ করি সে কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। তার পর জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "আমার আবার সুখ কি? সবাই সুখী হ'লেই সেই সুখে আমি সুখী হব।"

তথাপি তাহার কণ্ঠে বিষাদের সুর বাজিয়া উঠিল। চোখের জলের আভাসে সম্মুখের কাজ বাধা পাইতে লাগিল। কল্যাণী সেলাইটা ফেলিয়া দিয়া উদ্ধত ভাবে বলিয়া উঠিল, "আমাদের আসবার দিনও, প্রভাস বাবু কত আশা ক'রে বলেছেন, 'আর এই কটামাস তোমরা অপেক্ষা করো। আমি আমার যথাশক্তি তোমাদের জন্য করবো।' তাঁকে তুমি কি অপরাধে ত্যাগ কর্ব্বে দিদি? এতে যে মহাপাতক হবে। আজ দু তিন বৎসর ধ'রে মাসিমা তাঁকে কথা দিয়ে রেখেছেন, তিনি তোমার জন্য নিজের প্রাণোৎসর্গ ক'রে মানুষ হবার চেষ্টা করছেন। এখন হঠাৎ এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌লে সে কি ধর্ম্মেই সইবে?" সুমিত্রা হঠাৎ সেলাইটা ফেলিয়া দিয়া বোনের কাঁধে মুখ লুকাইল। "কলী, চুপ কর ভাই! তাঁকে বলিস, দিদি তার বাপ মাকে রক্ষা করবার জন্য আত্মবলি দিয়েছে। জীবনে যে নরক যন্ত্রণা সইতে যাচ্চে, তার মরণের পরে নরকের ভয় কোথা?" কল্যাণী চুপ করিয়া রহিল।

রাত্রে ছোট ভাই বোনগুলিকে ঘুম পাড়াইয়া, রুগ্না মাতার পায় হাত বুলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া কল্যাণী রান্নাঘরে গিয়া দেখিল, হাঁড়ি হেঁসেল তুলিয়া সুমিত্রা কল্যাণীর ভাত একখানি পাথরে বাড়িয়া লইয়া বসিয়া আছে। কেরোসিনের ডিবের আলো অনর্গল ধূম বাহির করিতে করিতে মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে, আর সেই দিনের আলোরও অপ্রবেশ্য ক্ষুদ্র ঘরের দারুণ অন্ধকার ঈষৎ মাত্র দূর ও ঝুলের প্রচুরতা বৃদ্ধি করিতেছে। কল্যাণী মাটীর কলসী হইতে দুইটী ছোট চুমকি ঘটিতে জল গড়াইয়া আনিল। দুইখানি দেবদারু কাঠের পিঁড়ী আঁচল দিয়া মুছিয়া ঘরের বাহিরে রোয়াকের উপর পাতিল এবং জল-হাত দিয়া স্থানটী মুছিয়া হাত ধুইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "দিদি এসো, ওমা! এতকটি ভাত কেন? কুলয়নি বুঝি?" সুমিত্রা বাড়া ভাতের পাথর খানা হাতে করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, না, তা কেন, আমার আজ ক্ষিধে নেই, তুই খেতে বস্।" কল্যাণীর মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল। সে দ্বারে পিঠ দিয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। গম্ভীর মুখে বলিল, "আজ তিন দিন হ'ল রোজই তোমার রাত্রে ক্ষিধে থাকে না, সকালেও রোজ কম পড়ে। আজ সকালেতো খাওয়াই হয়নি, এমন করে না খেয়ে ক'দিন বাঁচবে, দিদি? তুমি খাও, আমি আজ খাব না, আমিত ওবেলা পেট ভরে

খেয়েছি।” সুমিত্রা ম্লান মুখে কষ্টে হাসি আনিয়া বলিল, “কি বলিস্ তার ঠিক নেই; সত্যি বলছি, আমার ক্ষিধে নেই, না হ’লে দুটী আর রেঁধে নিতে পারতুম না?”

“চাল কোথায় যে, রাঁধবে? রোজ রোজ চাল কিনে কি চলে? একেবারে কিন্‌লেই হয়।”

সুমিত্রা বাধা দিয়া বেদনার স্বরে কহিল, “টাকা কোথায় যে একবারে কিন্বো বল? ধারেই তো সব চলচে। কলী, বস্ ভাই, খেয়ে নে, মাথাটা বড্ড ধরেছে, আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে।”

কল্যাণী একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তবে এস, দুজনেই এই ভাতকটা ভাগ ক’রে খাই, তা না হ’লে আমিও আজ কিছুতেই খাব না।”

সে রাত্রে কল্যাণী কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। ভাবনার পর ভাবনা আসিয়া তাহার চিত্তকে একেবারে পীড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া পাশের ঘুমন্ত ভাইটীকে নিজের বিছানায় তুলিয়া শোয়াইয়া দিয়া সে তাহার দিদির কাছে গিয়া শুইল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহার দিদিও আজ তাহারই মত ঘুমাইতে পারে নাই। কল্যাণীর কাছে আসিয়া শোয়াতে সুমিত্রা সহসা চমকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কিরে কলী, এখনও ঘুমুস্‌নি যে?”

কল্যাণী সুমিত্রার কণ্ঠস্বরে বুঝিতে পারিল যে, সে এতক্ষণ কাঁদিতেছিল। ধীর স্বরে উত্তর দিল, “ঘুম হচ্ছে না, ভারী গরম, তুমিও ত জেগে আছ।”

“হাঁ মাথাটা বড় ধরেছে, জানালাটা না হয় খুলে দে না।”

“না, থাক, ছেলেদের আবার ঠাণ্ডা লাগ্বে। এস তোমার মাথাটা একটু টিপে দি; তাহলে ছেড়ে যাবে এখন।” সুমিত্রার আপত্তি না মানিয়া কল্যাণী তাহার মাথার কাছে বসিয়া কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। সুমিত্রা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল, “সকালেই সেই খাট্‌নি আছে। শুয়ে ঘুম, কলী।” কল্যাণী আপনার জিদ্ কখনও ছাড়ে না, কাজেই শেষে সে নিজেই থামিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কল্যাণী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, ‘আচ্ছা দিদি, হৃদয় বাবু দেশ বিদেশে এত মেয়ে থাক্‌তে তোমাকেই যে হঠাৎ বিয়ে কর্‌তে চাইলেন, এর মানে কি? তিনি কি তোমায় ভালবাসেন?” সুমিত্রা এ সম্বন্ধে কোন কথাই ভাবিয়া দেখে নাই। সে ভাবিয়াছে, তাহাদের দারিদ্র্য ভয়ানক অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিবাহে সে দরিদ্রতা ঘুচাইয়া সচ্ছলতা লাভ করিতে পারিবে। সে ভাবিয়াছিল,

তাহার চিরদুঃখিনী মা ঔষধ পথ্যের অভাবে এই চিরদুঃখের জীবন সাঙ্গ করিয়া তাহাদের জন্মের মত ছাড়িতে উদ্যত। এইবার বুঝি তবে সে তাহাকে ধরিয়া রাখিবার পথ পাইল। একটু বিস্ময়ের সহিত উত্তর দিল, "তাতো জানিনে; হয়তো তাই বা, না হ'লে হঠাৎ বিয়ে করতে চাইবেন কেন?"

উত্তরটা কল্যাণীর মতের সহিত মিলিল না। সে সেই অন্ধকারে দিদির মুখের উপর বিরক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঈষৎ তীব্রভাবে বলিয়া উঠিল, "তা বই কি? বড়লোকের আবার ভালবাসা! বোধ হয়, তোমার সুন্দর রূপ দেখেই বিয়ে কর্‌তে চেয়েছেন।" সুমিত্রা ধীরভাবে কহিল, "তাও হ'তে পারে, তবে সুন্দর এমন কি দেখলেন!" কল্যাণীর মুখ গভীর চিন্তায় গম্ভীর হইয়া আসিল। সে শুইয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে চিন্তাযুক্ত ভাবে বলিল, "তাই বোধ হয় হবে।"

পর দিন সকালে উঠিয়া সুমিত্রা প্রতিদিনকার মত ঘরের কাজ-কর্ম্ম সারিতে গিয়া দেখিল, কল্যাণী তাহার আগে উঠিয়া বাসিকাজ সারিয়া ফেলিয়া উনানে আগুন দিতেছে। সুমিত্রার সাড়া পাইয়া সে ধোঁয়ায় অদৃশ্য প্রায় মুখ তুলিয়া বলিল, "দিদি আজ আর তুমি স্কুলে যেয়ো না, লোকে যদি শুনে থাকে, তবে কি বল্‌বে? আমি তোমার বদলে যাচ্ছি।" জেলখানার খোলা দরজার সম্মুখে মুক্তির পরওয়ানা শুনিলে কয়েদের আসামী যেমন গভীর আনন্দের সহিত নির্ব্বাক্ ভাবে চাহিয়া থাকে, সুমিত্রা তেমন করিয়া কতক্ষণ বোনের পানে চাহিয়া, স্নান করিতে চলিয়া গেল।

কল্যাণী কলিকাতা হইতে আসিয়া অবধি নিজের অঙ্গের দিকে চাহিয়া দেখিতে অবসর পায় নাই। আজ সে এক পয়সার বেশম আনাইয়া আধঘণ্টা ধরিয়া গায়ের কালী তুলিতে বসিল। গরম তৈলের ছিটায় হাতে কতকগুলা ফোস্কা উঠিয়াছিল। ঘর্ষণে তাহা ছিঁড়িয়া গিয়া জ্বালা করিতে লাগিল। তথাপি সে অঙ্গ মার্জ্জন বন্ধ করিল। কাপড় ছাড়িয়া যখন রান্না ঘরে আসিয়া ভাত চাহিল, তখন অকস্মাৎ মুখ তুলিয়াই সুমিত্রা সবিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। একি তাহারই বোন কল্যাণী? ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত ভিতরে ভিতরে কি সৌন্দর্য্যই লুকান ছিল! সুমিত্রা বুকের কাছে কুণ্ডলিত নিশ্বাসটা টানিয়া লইল। সে স্বার্থপরের মত এখনও দ্বিধা করিতেছে। না, সবার সুখের জন্য সে নিজের সকল স্বার্থ ভুলিবে। নহিলে এই সব স্নেহের পুতুলের কি হইবে?

কল্যাণী আহারে বসিয়া স্কুল সম্বন্ধে দিদিকে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করিতেছিল। কিন্তু তাহার চিত্ত ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উদ্বেগ-ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, তাহা তাহার মুখের চক্ষের ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল। সুমিত্রা মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "কিছুতেই যে খেতে পার্‌লি না, কল্যাণী"। কল্যাণী অন্যমনস্কভাবে জলের গ্লাস

তুলিতেছিল, হাত কাঁপিয়া জল শুদ্ধ গ্লাসটা থালার উপর পড়িয়া গেল। লজ্জায় ও বিরক্তিতে ঈষৎ লাল হইয়া সে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, “সকালে খাওয়া ত আর আমার অভ্যাস নেই।”

## ৪

সেদিন হৃদয়নাথ অন্য দিনের অপেক্ষা সকাল সকাল আহার সারিয়া খিড়কির বাগানে সেই লোহার বেঞ্চের উপর কামিনী গাছের ছায়ায় বসিয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটা ভরিয়া আজ একটী নবীনত্বের হিল্লোল উঠিতেছিল। বসন্ত আসিতে দেখিলে যেমন মলয়ানিল তাহার আগমনবার্ত্তা পূর্ব্বেই ঘোষণা করিতে থাকে, তেমনই বোধ হয়, আগতপ্রায় মিলনে একটী মধুর উচ্ছাসে বিগতপ্রায় দেবেন-সীমার প্রান্তবর্ত্তী গম্ভীর-প্রকৃতি প্রৌঢ়কে ঈষৎ উচ্ছ্বসিত করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারই হৃদয়-ডালির আহরিত অর্ঘ্যে প্রেমও চারিপাশে পুষ্পসৌরভরূপে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। বাতাসে আকাশে পত্রে পুষ্পে সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠিতেছে। সে সঙ্গীতের প্রতি চরণই তাহাদের গৃহলক্ষ্মীর বন্দনা-গানে অমৃতময়।

হৃদয়নাথ কোলের উপর একখানা বাঁধান বই রাখিয়া পুনঃ পুনঃ গ্রাম্য পথের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। একবার হঠাৎ তাঁহার মুখখানা আনন্দের জ্যোতিতে সম্পূর্ণ উজ্জল হইয়া উঠিল। বাতাসে স্থানভ্রষ্ট কেশ কয়গাছি সাবধানে স্বস্থানে স্থাপিত করিয়া রুমালে মুখবানা মুছিয়া ফেলিয়া সংযত ভাবে তিনি পুস্তক পাঠে মনঃসংযোগ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে বেড়ার পাশে কাহার পায়ের মৃদু শব্দ হইল। হাতের চুড়ি কয়গাছি ঠন্ ঠুন্ করিয়া একটা কি যেন অস্ফুট সন্দেহের কথা বলিতে চাহিতেছিল। হৃদয়নাথ স্তম্ভিত বক্ষে বসিয়া রহিলেন। ইচ্ছাসত্ত্বেও চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না। প্রথম দিনটা মনে যে কবিত্বের উচ্ছাস উঠিয়াছিল, আজ তাহা মিলাইয়া আসিয়াছে। বাগ্‌দত্তা স্ত্রীকে কি বলা যাইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখা হয় নাই। যখন সঙ্কোচ কাটাইয়া তিনি মুখ তুলিলেন, তখন স্কুলগৃহের দ্বারের মধ্যে একখানি শুভ্র হস্তের একটা অংশ ও এক রাশি কাল চুল মাত্র চোখে পড়িল।

কল্যাণী পরদিনও স্কুলে গেল। হৃদয়নাথ দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া বেলা তিনটার সময় হইতেই বাগানে রৌদ্র মাথায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গোলাপগাছের কলম তৈয়ার করিবার জন্য মালীকেও হঠাৎ তাঁহার খুব দরকার হইয়া দাঁড়াইল, দু একটা গাছের কলম করা সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়াই হৃদয়নাথ তাহাকে ফরমাইস্ করিলেন, “খুব ভাল ক’রে একটা গোলাপের তোড়া তৈয়ার কর দেখি।” মালী আজ্ঞা পালন করিল। তোড়াটা হাতে লইয়া কিন্তু, হৃদয়নাথের একটু লজ্জা করিতে লাগিল, মালীটা কিছু বুঝিতে পারে নাই ত?

সকলেই এতাবৎকাল তাঁহাকে নির্হৃদয় কৌমার্য্যব্রতধারী বলিয়া জানে। সহসা নিজের সেই পরিচয়টুকু নষ্ট করিতে হৃদয়নাথের মনের মধ্যে আনন্দের সঙ্গেও তাই একটা ব্যথাও যেন বাজিতেছিল।

ঘড়িটা চারিটা বাজাইয়া চুপ হইল! কিন্তু হৃদয়নাথের বুকের মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিয়া একটা সুর তালে তালে বাজিয়াই চলিল,—বিশেষতঃ যখন স্কুলের আলকাতরা মাখান ছোট দরজাটীর ভিতর দিয়া নিপুণভাবে ঝুলান একটী শুভ্র বস্ত্রের আঁচলখানি দক্ষিণের উদ্দাম বাতাসে চঞ্চল হইয়া দর্শন দিল।

সেদিন জোর করিয়া সমস্ত সঙ্কোচ ও লজ্জা ত্যাগ করিয়া হৃদয়নাথ দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কল্যাণীর এই সময়ের ভিতর উদ্যানের সীমানা ছাড়াইয়া যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে তাহার মৃগশিশুর মত অবাধ চঞ্চল গতিকে এমনই অকস্মাৎ গজেন্দ্রগমনে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, তাহার নাগাল পাইতে হৃদয়নাথকে বাগানের দরজা পার হইতে হইল না। হৃদয়নাথ মৃদুস্বরে ডাকিলেন, “সুমিত্রা!” কল্যাণী ফিরিয়া দাঁড়াইল। হৃদয়নাথ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সুমিত্রা নয়। কিন্তু রং গঠন অনেকটা একরকম বলিযাই তাঁহার এ সন্দেহ জন্মে নাই। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন “কে?” কল্যাণী তাঁহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া উত্তর দিল, “আমি কল্যাণী, সুমিত্রার বোন্।”

হৃদয়নাথ আরও আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। ঐ দরিদ্র-গৃহখানি রত্নের আকর নাকি? তার চেয়ে বিস্মিত হইলেন মেয়েটীর ধরণে লজ্জা নাই, দ্বিধা নাই, অথচ এতটুকু নির্লজ্জতাও নাই। শান্ত নির্ভীক চক্ষু বুদ্ধি ও জ্ঞানের জ্যোতিতে আশ্চর্য্য উজ্জ্বল! বলিলেন, “সুমিত্রা কি আসেনি?”

কল্যাণী ঈষৎ চোখ নামাইয়া কহিল, “না, কাল থেকে আমিই আস্ছি।” তারপর আবার দুই চোখ তুলিয়া হৃদয়নাথের চোখের উপর স্থাপন করিল, বলিল, “কেন? তাতে কি কিছু আপনার আপত্তির কারণ আছে?”

একটু সঙ্কুচিত হইয়া হৃদয়নাথ কহিলেন, “না তা কেন?”

“তবে এখন আমি যেতে পারি?”

“হ্যাঁ, পার—না, একটা কথা আছে, সুমিত্রা কেন আসে না? সে কি কিছু এর কারণ বলেছে?”

কল্যাণী একবার প্রশ্নকর্ত্তার মুখে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরমুহূর্ত্তে অন্যদিকে চাহিয়া অন্যমনস্কতার ভাণ করিয়া আঙ্গুলে নিজের আঁচল জড়াইতে

জড়াইতে বলিল, “বলেছে বই কি! আপনি তাকে বিয়ে করবেন বলেছেন না?”

হৃদয়নাথের মুখ আকর্ণ লাল হইয়া উঠিল, তিনি মাথা একটু নিচু করিলেন, “তা সেজন্য তিনি আর আসেন না কেন?”

কল্যাণী আঁচলখানা ছাড়িয়া দিয়া হাসিয়া ফেলিল, “বাঃ, বিয়ের কথা হচ্ছে, সে কেমন ক’রে আসবে? তা ছাড়া তার মন আর শরীরও তেমন ভাল নেই।” শেষের কথা কয়টা বলিয়া কল্যাণী গম্ভীর হইয়া পড়িল। এবং যাইবার জন্য উদ্যোগী হইল। ব্যগ্র হইয়া হৃদয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, “মন ভাল নেই কেন? না, না, তুমি কথা বদ্‌লাচ্ছ। আমি বেশ বুঝতে পার্‌ছি। কল্যাণী বুঝি তুমি?—না, কল্যাণী আমায় বল, কেন তার মন ভাল নাই?”

কল্যাণী চুপ করিয়া রহিল। দ্বিধা আসিয়া দুএকবার বাধা না দিতেছিল এমন নহে, কোন্‌টা উচিত, কোন্‌টা শুভ সে সন্দেহও দুই একবার মনে উঠিয়া তাহার স্থির দৃষ্টি চঞ্চল করিয়া তুলিতে লাগিল। সহসা কথা জোগাইল না। হৃদয়নাথ একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া মিনতিপূর্ণ আগ্রহের সহিত আবার বলিলেন, “তুমি আমায় কিছু লুকিও না। বল কল্যাণী, বল, সে কি আমার প্রস্তাবে মনে কোন আঘাত পেয়েছে, আমি কি তার কাছে অযোগ্য আবেদন করেছি?”

“হ্যাঁ” বলিয়া কল্যাণী তাঁহার পানে স্থির চোখে চাহিয়া রহিল।

হৃদয়নাথ চমকিয়া উঠিয়া দুই পা পিছাইয়া গেলেন। বিস্ময়ের সহিত বেদনার সুস্পষ্ট চিহ্ন তাঁহার শ্রীহীন মুখে ফুটিয়া উঠিল। একটু নীরবে থাকিয়া আত্মসম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে অস্ফুট কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কি আমায় বিয়ে ক’রতে ইচ্ছুক নয়?”

বাতাসে কতকগুলা চুলের গোছা কল্যাণীর মুখে চোখে উড়িয়া পড়িতেছিল, হাত দিয়া সে গুলাকে সরাইয়া দিতে দিতে সে উত্তর দিল, “কতকটা তাই বটে। প্রভাস বাবুর সঙ্গে দিদির বিয়ের সব ঠিক ছিল, হঠাৎ মাসীমা মারা গেলেন বলেই শুধু হলোনা। সেইজন্য আর কোথাও বিয়ে হয় সেটা আমাদের কারু তেমন ইচ্ছা ছিল না।”

হৃদয়নাথ উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, “তা হ’লে সে আমাকে কিছু বলিল না কেন? আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিল কেন?”

“কেন? তুমি তার কি জান্‌বে যে কেন? আমাদের মা বাপের অবস্থা খুবই খারাপ, মার জীবনের আশা নাই, চিকিৎসা পথ্যের অভাবে মা মারা যাবেন, ভাই

বোনদের একবেলা আহার জোটে তো একবেলা জোটে না। সে সম্মত না হয়ে কি করে? সে তত নভেলের নায়িকা নয়?"

হৃদয়নাথ আহত হৃদয়ে চৌকাটের উপরে বসিয়া পড়িলেন। হাত হইতে গোলাপ ফুলের তোড়াটা মাটিতে পড়িয়া গেল। জীবনের নবসঞ্চিত কাব্যরস নিম্বপত্রের মত তিক্তাস্বাদ হইয়া উঠিল। কল্যাণী একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাঁহার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর একটু নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাহলে আমি এবার যাই?"

হৃদয়নাথ চম্‌কাইয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিলেন। কল্যাণী দেখিল, তাঁহার মুখ অত্যধিক ম্লান হইয়া গিয়াছে। তাঁহার জন্য তাহার একটু দুঃখ হইল, একটা সন্দেহও জন্মিল, একটু বিষন্নভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি আপনাকে কষ্ট দিলাম—না? হয়ত এ কথা আপনাকে বলা আমার উচিত হয়নি।"

"না উচিত হয়েছে বইকি? না হ'লে আমার দ্বারা তোমার দিদির কত বড় ক্ষতি হ'ত বল দেখি? আমার কষ্ট, ঈশ্বর জানেন। এখন যেটা আঘাত মনে হচ্চে, পরে সেটাই হয়ত পুরস্কার মনে হবে। কি ভাল, শুধু তিনিই জানেন।"

একটা অনিবার্য্য কৌতুহলের সহিত কল্যাণী বলিয়া উঠিল, "আপনারা—বড়লোকেরা কি তবে গরীবের মেয়েদের সৌন্দর্য্যের মুল্যেই শুধু তাদের গ্রহণ করিতে চান, না? তাহলে আরও তো অনেক সুন্দর মেয়ে আছে।"

হৃদয়নাথ ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটী করিলেন। কল্যাণী ঈষৎ লজ্জার সহিত মাথা নীচু করিল। তখন হৃদয়নাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমার দিদিকে গিয়ে বল কল্যাণী, আমি তাকে মুক্তি দিলুম, তার মহৎ হৃদয় বিক্রী করবার জিনিষ নয়। এর দাম দেবার সাধ্য আমার নাই, যে ভাগ্যবান্ তা জয় করেছেন তিনি ইহা লাভ করুন। তোমাদের দারিদ্র্য আর থাক্‌বে না। আমার যথাসাধ্য তোমাদের জন্য আমি কর্‌বো। সেজন্য আজ হ'তে তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। আর আমার জন্যে—ভগবান্ যা ভাগ্যে লেখেন নি, তার জন্যে দুঃখ ক'রে কি হবে? আমার এই নিঃসঙ্গ নিষ্ফল জীবন এমনই কেটে যাক। এ একটা আমার শিক্ষা হলো।"

লজ্জায় অনুতাপে মরিয়া গিয়া কল্যাণী ভাবিল, সে ইহার প্রতি বড় অবিচারই করিতেছিল। তাঁহার রুদ্ধ স্বরের ভিতর যে অশ্রুজল পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, সহসা তাহা কল্যাণীর চক্ষুকে বশীভূত করিল না কি? তাহার চোখও সমবেদনার অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়া টল টল করিতে লাগিল। কি বলা উচিত ভাবিয়া না পাইয়া সে নতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হৃদয়নাথ ক্ষণকাল

নীরবে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর ত্বরিত হস্তে ফুলের তোড়াটা মাটী হইতে কুড়াইয়া লইয়া কহিলেন, "যা তাকে দেবার জন্য রেখেছিলুম তা আবার ফিরিয়ে রাখ্‌লুম। পূর্ব্বেই আমার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যদি কখনও কেউ যেচে নেয়, তবেই তাকে এ হৃদয় মন দান কর্ব্বো, তা' না হ'লে অযোগ্যের দান দীনের উপহার চিরদিনের মত নিজের কাছে থেকেই শুকিয়ে যাবে—সে প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গেচে, হাতে হাতেই তার ফলও ফলেচে। যাক্—এবার যেতে পার কল্যাণী, আর কিছু বলবার নাই। বলো, আমি মনের সঙ্গে তাকে আশীর্বাদ কর্‌চি, তারা দুজনে চিরসুখী হোক। আমি তাদের সুখের জন্য যেটুকু সাধ্য তা চেষ্টা কর্‌বো—কুণ্ঠিত হবো না—যাও।"

কল্যাণী শক্ত করিয়া পা দিয়া মাটী চাপিয়া দাঁড়াইল, নিম্নদৃষ্টি জোর করিয়া উন্নমিত করিয়া তাঁহার চোখের উপর চোখের দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ম্লান হাসির সহিত কহিল, "ব্যস্ত হবেন না, যাচ্ছি, কিন্তু কিছু যদি মনে না করেন তো বলি—আপনার অনাদৃত ফুলের তোড়াটা দয়া ক'রে আমায় দেবেন কি? অমন ভাল ফুল আমি আর কখনো দেখিনি।"

"নেবে তুমি? যথার্থই সাধ ক'রে আদর ক'রে নিতে পারবে? না এ শুধু করুণা চিত্তের করুণার ক্ষণিক ইচ্ছা মাত্র কল্যাণি?"

কল্যাণী নতমুখে কহিল "আমার চিত্ত খুব যে করুণ নয়—তারও প্রমাণ আপনি পেয়েছেন, আর আমি যা একবার স্থির করি—তার কখন বদল হয় না। এখন আপনার তোড়া দেওয়া না দেওয়া সে আপনার ইচ্ছা।"

# লঘুক্রিয়া

১

গ্রীষ্মের ছুটীর পর যেদিন স্কুল কলেজ খুলিবে, তাহার দুইদিন পূর্ব্বে ব্রেকফাষ্টের সময়, অ্যালিস তাহার খুল্ল পিতামহের বাহুর উপর হেলিয়া পড়িয়া আদর মাখা স্বরে তাঁহাকে অনুরোধ করিল "দাদা! ফ্যানীর ছুটী শেষ হ'লো, সে চ'লে যাবে, তাকে যেতে বারণ কর না দাদা!" ফ্যানী তাহার সঙ্গীতধ্যাপকের কন্যা, কলিকাতায় কোন বালিকাবিদ্যালয়ের শিল্প-শিক্ষয়িত্রী, গ্রীষ্মাবকাশে পিতার নিকট মৃজাপুরে আসিয়াছিল, স্কুল খুলিবার সময় হওয়ায় ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে।

অ্যালিস পিতামহের বড় আদুরে। সে যাহা আবদার ধরিত, তিনি নির্ব্বিচারে তাহাই পালন করিতেন। ছোট বেলা হইতে অত্যধিক আদর দিয়া তিনিই তাহাকে এত বড় একগুঁয়ে তৈরি করিয়া তুলিয়াছিলেন। আজিকার এই অসঙ্গত অনুরোধে দাদা মশাই যখন হাসিয়া বলিলেন; "এই দেখো, পাগলী মেয়ে কোথা থেকে একটা হুকুম নিয়ে এলো।"—আর তার উত্তরে অ্যালিস তাঁহার দেহের উপর আরো একটু হেলিয়া আবদারের সঙ্গে বলিতে লাগিল, "না দাদা সত্যি, ওকে থাক্‌তে বলোনা। ওকে আমার খুব ভাল লাগে, ও এবার থেকে আমাদের বাড়ী থাক্।" তখন টেবিলের অপর পার্শ্বে বসিয়া, যে এতক্ষণ চুপ করিয়া চা পান করিতেছিল, সেই ব্যক্তি চা পান বন্ধ করিয়া বিরক্ত স্বরে বলিল "লিসা! তোর এ সব ভারি অন্যায় কথা। ও তোর কথায় চাকরী ছেড়ে দেবে নাকি? তুই আজকাল ভারী আবদার আরম্ভ করেছিস্ যে দেখতে পাই।" এই যুবক অ্যালিসেরই বড় ভাই। নাম চার্লস ফষ্টার, হেন্‌রী ফষ্টারের ভ্রাতুষ্পৌত্র এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। যুবক ফষ্টার সুশ্রী, সবল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ভূষণে ভূষিত। সম্প্রতি দাদা মহাশয়ের আদেশে পড়া শুনা ছাড়িয়া আসিয়াছে। হেন্‌রীর ইচ্ছা ভ্রাতুষ্পৌত্‌ত্রও তাঁহার মত ব্যবসা কার্য্য এই সময় হইতেই শিক্ষা করে। এই ঊষ্ণস্বভাব যুবা তাহার খুল্লপিতামহের কম স্নেহের পাত্র ছিল না, তথাপি চার্লসের বিশ্বাস, দাদা অ্যালিসকে তাহাপেক্ষাও অধিকতর ভাল বাসেন। একথা সে প্রকাশ্যে ও অনেকবার বলিয়াছে এবং তাহা শুনিয়া তাহার দাদা একটু স্নেহের হাসি হাসিয়াছেন মাত্র, প্রতিবাদ করেন নাই। আজ ভাইয়ের কাছে ধমক খাইয়া অভিমানিনী অ্যালিস, সক্রোধে অর্দ্ধভুক্ত বিস্কুটখানা পাত্র-সমেত সশব্দে ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। হেনরী ব্যস্ত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন, "যাস কোথা লিসা? বোস্ বোস্! চার্লি, তুমি ওকে অমন করে ব'লো না, আহা ছেলে মানুষ, অল্পেই মনে আঘাত পায়।

আচ্ছা লিসা, তোর ফ্যানী সেখানে কত মাইনে পায় বলতো রে?” অ্যালিস অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ বুঝিয়া আসন গ্রহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিল “বড় কম পায় দাদা—বড় কম। প্রত্যহ তিন ঘণ্টা পরিশ্রম ক’রে, মাসে কুড়ি টাকা পায়, তাতে কখনো মানুষের চলে? তাই জন্যে ও আবার একজনদের বাড়ী বাজনা শেখায়, শেলাই শেখায়, আহা ও যা সুন্দর শেলাই করে, ওকে যদি রাখ তো আমি ওর কাছে শেলাই শিখ্‌বো?” “আচ্ছারে পাগলী রাখা যাবে, যা। তোর মাষ্টারকে ডেকে আন্‌গে।” অ্যালিস “আচ্ছা” বলিয়া লাফাইয়া উঠিয়া মাষ্টারের উদ্দেশ্যে ছুটিল। চার্ল্‌স বলিল, “দাদা মশাই, ভাল কল্লেন না। গরীবের মেয়েটার সঙ্গে মিশে ও কিন্তু আরও বিগ্‌ড়ে যাবে ত। আমি ব’লে রাখলেম্ দেখে নেবেন।” দাদা মশাই নিঃশেষিত চা পাত্র টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে উত্তর করিলেন, “ও গো সে ভয় নেই। ফ্যানীকে আমি দু একদিন দেখেছি, মেয়েটি বড় শান্ত ও সৎ স্বভাব। ওর সঙ্গ, বোধ হয় অ্যালিসের পক্ষে উপকারীই হবে।” “তবে যা ভাল বোঝেন করুন, অ্যালিসকে কিন্তু বড় বেশী আদর দেওয়া হচ্ছে! এতো বাড়াবাড়ী কিছু নয়।” বলিয়া বিরক্তভাবে চার্লস ফষ্টার নিজের টুপী ও ছড়ি লইয়া বাহির হইয়া গেল।

ফ্যানীর নাম মেরিয়ান কি মারগারেট এমনি কি একটি রাখা হইয়াছিল তাহা ঠিক জানা নাই। তাহার আদরের নাম ফ্যানী। আর এখন তাহাই চলিত হইয়া গিয়াছে। গরীবের সুন্দরী মেয়ে ফ্যানী অনেক বড় ঘরের মেয়ের চেয়েও অধিকতর সৌন্দর্য্য লইয়া জন্মিয়াছিল। তাহার ভাবব্যঞ্জক গভীর নীল চোখে, তাহার মধুর কণ্ঠস্বরে এমন কি মোহিনী শক্তি ছিল যে, যে তাহাকে দুইদিন দেখিয়াছে সে তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। ফ্যানীর মা কোথাকার হাস্‌পাতালের লেডি ডাক্তার ছিলেন, তিনিই একমাত্র কন্যা ফ্যানীর শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। আজ তাঁহার মৃত্যুতে পিতা পুত্রী পরস্পর বিচ্ছিন্ন। সে বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ফ্যানীর পিতা রবার্ট এনড্রু প্রসিদ্ধ সওদাগর হেন্‌রী ফষ্টারের ভ্রাতুষ্পৌত্রীর গৃহশিক্ষক। ফ্যানীর নূতন চাকরী ঠিক হইয়া গেলে, পিতা ও কন্যা উভয়ে প্রভুর নিকটে অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। বৃদ্ধবয়সে কন্যাকে নিকটে পাইয়া রবার্টের আর খুসীর সীমা রহিল না।

পিতামহের চক্ষের অন্তরালে আসিয়াই অ্যালিস দুই হস্তে ফ্যানীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ফ্যানী দেখিল, তাহার চোখে মুখে হাসি উছলিয়া পড়িতেছে। সে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার করমর্দ্দন করিয়া বলিল, “মিস্ ফষ্টার, তোমায় কি বলে ধন্যবাদ দেবো আমি বুঝতে পার ছি না। তোমার কাছে ভাই চিরঋণী রইলাম।”

অ্যালিস সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহার বাহু আকর্ষণ করিয়া কহিল, —“চলো আমরা পাখীদের খাবার খাওয়া দেখিগে।”

মৃদুনম্বরে ফ্যানী বাধা দিল।—"না মিস্ ফষ্টার, আজ আমায় ক্ষমা করো, আজ সকল কার্য্যের পূর্ব্বে প্রভু, পিতা ও তোমার জন্য ঈশ্বরের নিকট একবার ভাল ক'রে প্রার্থনা করিবো।"

এই বলিয়া সে অ্যালিসের করমর্দ্দন করিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। অ্যালিস ঈষৎ ক্ষুন্নভাবে দাদা মহাশয়ের নিকট ফিরিয়া আসিল। প্রথম উচ্ছ্বাসে বাধা প্রাপ্ত হইয়া তাহার মনটা একটু দমিয়া গিয়াছিল।

## ২

ফ্যানীর নূতন চাকরী প্রাপ্তির পর ছয় মাস হইয়া গিয়াছে। ফ্যানী ও অ্যালিসের বন্ধুত্ব ক্রমেই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছিল। অ্যালিস তাহার কাছে শেলাই এর বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে পারে নাই। যেহেতু তাহাতে তাহার মনই ছিল না। সেলাইয়ের কলটা ফ্যানীরই কাজে লাগিল। অ্যালিস বলিল, "সেলাই আর ভাল লাগে না দাদা, তার চেয়ে আঁক্‌তে শেখা ভাল।" তৎক্ষণাৎ অঙ্কন দ্রব্য সকল আসিয়া পৌঁছিল, কিন্তু কাজ বড় অগ্রসর হইতে দেখা গেল না। ফ্যানীই ছবি আঁকিত! সে শুধু বসিয়া বসিয়া রং, তুলি, পেন সিল তাহার হাতের কাছে যোগাইয়া দিত এবং একখানি ছবি সমাপ্ত হইলে তাহার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিত। চিত্রবিদ্যা এমনি করিয়া শিক্ষা হইলে, নূতন সখ হইল, বেহালা শিখিতে হইবে। গীতবাদ্যে একটু দখল থাকাতে অ্যালিসের অন্য সকল বিদ্যাপেক্ষা এই বিদ্যাটায় একটু উন্নতি হইল। কিন্তু এই ব্যাপারে এইবার ফ্যানী বেচারীকে বড় বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। এই কয় মাসে ফ্যানীর সহিত একটু করিয়া বৃদ্ধ গৃহস্বামীর পরিচয় ঘটিতেছিল। স্নেহপ্রবণ বৃদ্ধকে নাতিনীর অত্যাচারে এই পরিণত বয়সে নূতন করিয়া কিশোর বয়স্কোচিত খেলায় প্রবৃত্ত হইতে হইত। তাহাদের টেনিস খেলায়, তাহাদের কার্ড টেবিলে, তাহাদের পাখীর বুলি শিখানয় তাঁহাকে নিয়মিত উপস্থিত থাকিতেই হইত। প্রথম প্রথম ফ্যানী তাঁহার সম্মুখে আসিতে সঙ্কোচ বোধ করিত, কিন্তু ক্রমশঃই তাহার সে লজ্জা ও সঙ্কোচ অপসারিত হইতে লাগিল। এখন সে আদিষ্ট হইয়া প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় অ্যালিসের প্রতিনিধিত্বে গান শুনাইত। তাঁহার আদেশে কোন কোন দিন সংবাদপত্র বা নূতন পুস্তক পাঠ করিত। এমন কি, তাঁহাদের আলাপেও যোগ দিতে আর বড় একটা কুণ্ঠিত হইত না।

বৃদ্ধও যেন ক্রমে ক্রমে তাহার প্রতি কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। ফ্যানীর গান না শুনিলে, ফ্যানীর সহিত কথা না কহিলে, সন্ধ্যাটা যেন ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ক্রমে অ্যালিসের অল্পমাত্র চেষ্টায় ফ্যানী বৈকালিক ভ্রমণেও তাঁহাদের সঙ্গিনী হইল। তিনি যেন এতদিন পরে এই ষষ্টি বর্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার চিরকুমার জীবনের অসারত্ব অনুভব করিয়া

কিসের একটা অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাটা-পড়া জীবন-নদীতে কোথা হইতে যেন সহসা জোয়ারের টান দেখা দিল এবং সে বন্যা চড়া ডুবাইয়া কানায় কানায় উথলিয়া উঠিতে উদ্যত হইল।

চার্লস একদিনও এই দলে মিশিত না। সে স্বতন্ত্র ধরণের লোক। গৃহের এই হাসিখুসী গল্প গান উপেক্ষা করিয়া সে দিন রাত্রের অধিকাংশ কাল ক্লাব-ঘরেই যাপন করিত। বিশেষতঃ ফ্যানীকে সে দুটি চক্ষে পড়িয়া দেখিতে পারিত না। যেদিন ভোজনাগারে ফ্যানী উপস্থিত থাকিত, সেদিন সে দাদামহাশয়ের শত অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়াই নিজের ঘরে চলিয়া যাইত। সেখানে একা নিরানন্দ ভোজনও তাহার শ্রেয় বোধ হইত। সে যে সেই গরীব শিক্ষয়িত্রীকে আন্তরিক ঘৃণা করে, তাহা সে তাহাকে এমন স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া দিতে চাহে। তাহার নির্ব্বোধ বোনটাকে পাইয়া বসিয়াছে বলিয়া সে যেন নিজেকে তাহাদের সমকক্ষ বলিয়া কোনমতে মনে না করিয়া বসে। তাহার এই অন্যায় পক্ষপাত দেখিয়া অ্যালিস ভারি চটিয়া যাইত। সে এ সম্বন্ধে অনেকবার ভ্রাতার সহিত তর্ক করিতেও গিয়াছে, কিন্তু ফ্যানীর জন্যই পারে নাই। ফ্যানী সাধ্যপক্ষে কখন চার্লসের সম্মুখে আসিত না, দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইয়া গেলে ভদ্রতাটুকু বাঁচাইয়াই সরিয়া পড়িত।

## ৩

একদিন সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ সওদাগর অ্যালিসকে লইয়া একটা নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। ফ্যানী একাই বাড়ীতে রহিল। দৈবক্রমে চার্লস শারীরিক অসুস্থতার জন্য সেদিন সকাল সকাল বাড়ী ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। নির্ম্মল চন্দ্রকরে উদ্যান তখন ডুবিয়া গিয়াছিল, নববসন্তের মলয়ানিল উচ্চশীর্ষ ঝাউশ্রেণীর মধ্যে মৃদুমর্ম্মররব তুলিয়াছে; আনন্দময় কোকিল প্রস্ফুটিত আম্রমুকুলের সুবাসে পাগল হইয়া ডাকিতেছিল। রক্ত মর্ম্মর আসনে বসিয়া রজতালোকে অপ্সরার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া ফ্যানী আত্মবিস্মৃতের মত গাহিতে ছিল। তাহার বুক দুরদুর করিতেছিল, তাহার স্বচ্ছনের জলে ভাসিতে ছিল, তাহার ক্রোড়স্থ যন্ত্র থামিয়া থামিয়া বাজিতেছিল, যেন বিষাদে তাহারও স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সেই মুহূর্ত্তে অদূরে পদশব্দ শোনা গেল এবং চাহিয়া দেখিতে না দেখিতে চার্লস ফষ্টারের পরিচিত মুর্ত্তি জ্যোৎস্নালোকে ফ্যানীর চোখে পড়িল। সে ত্রস্ত হইয়া গান বন্ধ করিল; কিন্তু চার্লস সেদিন তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন না, বরং তাহার নিকটে আসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, “তুমিতো ভারি সুন্দর গাও, মিস্ এনড্র! আমি পূর্ব্বে তোমার গান এত মিষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারি নাই।”

ফ্যানী লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে কোলের যন্ত্রটা ভূমে নামাইয়া রাখিয়া অধোদৃষ্টিতে বসিয়া থাকিল, তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। চার্লস একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার গান শেষ করিলেনা?" ফ্যানী আবার আরক্ত হইয়া উঠিল। সে এবার চোখ তুলিয়া বিস্মিত ভাবে তাহার পানে চাহিল, দেখিল চার্লস তাহার মুখের দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। লজ্জিত হইয়া নত মুখে সে উত্তর করিল, "আমার গান কিছুই ভাল নয়?" কে বলিল ভাল নয়?" আমি আগে গান শুনিতে তেমন ভালবাসিতাম না বটে, কিন্তু স্বীকার করিতেছি, আজ আমার কানে তোমার গান ভারি মিষ্ট লেগেছে। এবার হ'তে প্রতিদিনই আমি তোমায় গান শুনাইবার জন্য অনুরোধ করিব। তুমি বিরক্ত হবেনাতো?" এই বলিয়া অনাহুত ভাবে চার্লস ফ্যানীর পাশে বসিয়া সাগ্রহ কণ্ঠে কহিল, "গানটা শেষ কর মিস এনড্র।" ফ্যানী ঈষৎ শিহরিয়া ব্যাকুলনেত্রে আবার তাহার পানে চাহিল, তারপর বাজনাটা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া কম্পিত কণ্ঠকে স্থির করিবার জন্য কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

## ৪

দিন কতকের মধ্যেই চার্লস ফষ্টারের অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন সর্ব্বলোচনে লক্ষিত হইল। সে ক্লাবঘর একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া ঘরের মধ্যে জাঁকাইয়া বসিল। প্রতি সন্ধ্যায় গানে, গল্পে, বৈকালিক ভ্রমণে, আহারে সর্ব্বদাই চালর্স উপস্থিত থাকিতে আরম্ভ করিল। হেনরী যখন বিষয়কার্য্যে ব্যস্ত, চার্লস তখন তাহার সঙ্গিনীদ্বয়কে সঙ্গদান করিয়া তাঁহার ত্রুটিপূরণ করিয়া লইতে থাকিত। এক কথায় চার্লস যতখানি দূরে চলিয়া গিয়াছিল, ঠিক ততখানি কাছে ফিরিয়া আসিল। সকল বিষয়েই তাহার একটা বাড়াবাড়ি করা অভ্যাস আছে বলিয়া, কাহারও চোখে ব্যাপারটা বড় নূতন বলিয়া ঠেকিল না। অ্যালিস এবার খুব খুসী। সে স্পষ্টই একদিন দাদামহাশয়কে বলিল, "দেখ্‌ছ দাদা! চার্লস এখন কেমন ফাঁদে পড়েছে, যেমন ফ্যানীকে ঘৃণা কর্‌তেন, তেমনি এখন ফ্যানী নইলে একদণ্ড আর চলেনা, খুব হয়েছে।"

কিন্তু কে জানে কেন নাতির এই গৃহানুরাগ তাহার চির স্নেহময় পিতামহের চিত্তে ততদূর সুখানুভূতি জাগাইলনা। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, চার্লী তাঁহার প্রাপ্য ধনে ভাগ বসাইতেছে, তাঁহার অংশ কাড়িয়া লইতেছে।

মনটা ঈষৎ অপ্রসন্ন হইয়া রহিল। সে সক্ষম সুন্দর যুবাপুরুষ, তাহার স্বাচ্ছন্দ্য তো চারিদিকেই বিস্তৃত রহিয়াছে। তবে সে কেন তাহার এই লোভনীয় শান্তিটুকুতে হাত দিতে আসিল? ফ্যানী প্রতিদিন চার্লসের আদেশে অনেক গান গাহিত। অ্যালিস দেখিত সে অবসর পাইলেই নূতন নূতন গান ও স্বরলিপি অভ্যাস

করিতেছে। সেও উৎসাহ দিয়া বলিত "হ্যাঁ ভাই! ভাল ক'রে শেখ্, চার্লস যেন না নিন্দা কর্ব্বার ছুতো পায়।" বৃদ্ধ হতাশভাবে বসিয়া গান শুনিতেন, কিন্তু তাঁহার আর তেমন তৃপ্তি হইতনা। এক একবার বাধা দিয়া কোন বই বা সংবাদপত্র পড়িতে বলিলে চালর্স সাগ্রহে বলিয়া উঠিত "আর একটা গান শোনা যাক।" একটা হইলে আবার একটার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই অনুরোধ হইত, হেনরী অনিচ্ছাসত্ত্বেও আর আপত্তি করিতে পারিতেন না।

একদিন বেলা তিনটার সময় কিছু বলিবার উদ্দেশে চার্লস ধীরে ধীরে পিতামহের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। রুদ্ধ জানালার পাশে একখানা ইজি চেয়ারে শয়ন করিয়া বৃদ্ধ সওদাগর তখন পাইপে ধূমপান করিতেছিলেন। নিকটেই একখানা বাণিজ্য বিষয়ক পুস্তক এবং তাঁহার চশমা পড়িয়া আছে। বোধ হয় পূর্ব্বে তিনি ইহা পাঠ করিতেছিলেন। ভ্রাতুষ্পন্নের পদশব্দে সজাগ হইয়া পাইপটা হাতে ধরিয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই যে তুমি এসেছ! তা ভালই হয়েছে, আমি এখনি তোমায় ডাকতে পাঠাব মনে করছিলেম। ব'স তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।" চার্লস ফষ্টার তাঁহার অনতিদূরে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিতে বসিতে বলিল, "আমারও আপনাকে কিছু বল্বার ছিল, কিন্তু আপনার বক্তব্যটাই পূর্ব্বে শোনা যাক।"

একটু ইতস্তত করিয়া হেরী ফষ্টার কহিলেন, "বেশ তাই ভাল, চার্লি! তুমি আর এখন নিতান্ত বালক নও, সব বোঝতো—তা তুমি বোধ হয় জান আমাদের পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি কিছুই ছিল না; থাক্বার মধ্যে কিছু ধন ছিল, এখনকার এই সমুদয় সম্পত্তিই আমার স্বোপার্জ্জিত, এতে তোমার বাপ পিতামহ, কারও কোন দাওয়া ছিল না। কেমন এ কথা ঠিক কি না?"

চার্লস ধীর ভাবে ঘার নাড়িয়া উত্তর করিল, "ঠিক বই কি!"

হেনরী ফষ্টার আবার গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন—"তোমার পিতার অকাল মৃত্যুতে আমিই তোমাদের দুজনকে সেই একান্ত শিশুকাল হ'তে লালন পালন ক'রে এসেছি, তোমরা বোধ হয় জান আমি তোমাদের প্রাণের তুল্য ভালবাসি।"

"হ্যাঁ, আর আমরাও সে জন্য আপনাকে ঈশ্বরের মত মান্য ক'রে থাকি।" এই কথা চার্লস বলিলে, প্রত্যুত্তরে হেনরী অত্যন্ত কোমলস্বরে বলিলেন,—"নিশ্চয়ই তাই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভক্তি, প্রীতি ও ভালবাসা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আজ সেই ভালবাসার দোহাই দিয়া বলিতেছি—'চার্লি, ভাইটি আমার! তুমি আমায় ভুল বুঝো না।"

যুবা ফষ্টার নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—“কি এমন কথা দাদামশাই! যার জন্য আপনি এত ইতস্তত কর্‌ছেন?”

একবার কাসিয়া গলা সাফ করিয়া রুদ্ধশ্বাসে হেনরী ফষ্টার বলিয়া ফেলিলেন—“চার্লি, চার্লি! তোমায় আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি আমি দানপত্রে লিখে দিয়েছি,—বাকি অর্দ্ধেক আমি নিজের জন্য রাখ্‌তে চাই, এতে তুমি ক্ষুন্ন হবেনাতো?—অ্যালিসকে অবশ্য—”

“এর জন্য আপনি এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন দাদা মশাই? আপনার টাকা, আপনি আমায় দয়া ক’রে যা দেবেন, আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট। আর এখন আপনার উইলেরই বা আবশ্যক কি?”

“আছে চার্লী, সে সম্পত্তিটা আমি মিস এনড্রকে দানপত্র লিখে দেব, তাতে তোমারও সই চাই।”

সাশ্চর্য্যে চার্লস বলিয়া উঠিল—“কি! কাকে, মস এনড্র! ফ্যানী?”—

অপরাধীর মত খুল্লপিতামহ নতমস্তকে উত্তর করিলেন,—“হঁ। ভাই! আমি তাকে কাল বিবাহ করবো।”

বজ্রাহতের মত ক্ষণকাল নিশ্চল থাকিয়া অকস্মাৎ দ্রুতস্বরে চার্লস বলিয়া ফেলিল—“ভারি অন্যায় কথা! আমি আপনাকে এই কথাই বল্‌তে এসেছিলাম যে, আমি ফ্যানীকে বিবাহ ক’রতে দৃঢ়সংকল্প, এ বিয়ে আপনাকে দিতেই হবে।”

পিতামহ কহিলেন—“এ বিবাহ এক প্রকার হয়েই গিয়েছে মনে করো। তুমি যদি বিবাহ ক’রতে ইচ্ছুক হয়ে থাক, সুন্দরী পাত্রীর অভাব হবে না, যাকে ইচ্ছা মনোনীত কর, দরিদ্রা ফ্যানী তোমার উপযুক্ত নয়।”

চালর্স সক্রোধে ভূমে পদাঘাত করিল—“তার চেয়ে আপনিই বরং যদি এ বয়সে বিবাহের লোভ সম্বরণ ক’রতে না পারেন, অন্য কাহাকেও বিবাহ করুন না। ফ্যানীকে আমি ভালবেসেছি। তাকে আমায় দিন। তাকে আমি অন্যের হাতে দেবো না।” হেনরিরও আর ধৈর্য্য রহিল না, তিনিও ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, “কি! আমারই ভয়ে প্রতিপালিত হয়ে, শেষে আমাকেই অপমান! যা, তুই আমার বাড়ী হ’তে এই মুহূর্ত্তেই চ’লে যা! দেখি তুই কেমন ক’রে এ বিবাহ বন্ধ করিস্।”

চার্লসও রোষে গর্জ্জিয়া উঠিল—“দেখবেন, কেমন ক’রে বিয়ে করেন! নাতির সঙ্গে ক’নে নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে আপনার লজ্জা হলো না! ধন্য!”

ক্রোধভরে চার্লস চলিয়া গেল।

## ৫

"ফ্যানি, ফ্যানি! জন্মের মতন চলে যাচ্ছি, তাই একবার শেষ দেখা ক'রে যাবো ভেবেছিলাম, তাতে বিরক্ত হওনি তো?"

ফ্যানী মুখ তুলিয়া চার্লসের পানে চাহিয়া বলিল— "মিঃ ফষ্টার!" আর কিছুই সে বলিতে পারিল না। চার্লস চমকিয়া তাহার হাত ধরিল—"ও কি ফ্যানী! আমার জন্য তুমি কাঁদ্চো? কেন ফ্যানী! আমি তোমার কে? তোমার শত্রু ভিন্ন আর তো কেহই নই। তোমার বিষয়ের অংশীদার ছিলাম, আমি না থাক্‌লে তুমিই নিষ্কন্টক হবে। তবে আমি যে ডেকেছিলাম, সে শুধু দুর্দ্দমনীয় হৃদয়াবেগে জ্ঞানশূন্য হয়েছিলাম ব'লে!"

ফ্যানী অস্ফুট স্বরে কি বলিল, বুঝতে না পারিয়া চার্লস সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "কি বল্লে মিস এনড্রু?

ফ্যানী কাতর চক্ষে চাহিল, চাঁদের পরিষ্কার আলোকে চার্লস দেখিল, জ্যোৎস্না-প্রতিমা হিমজলসিক্ত। আশান্বিত ভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল—"ফ্যানী, তবে তুমিও কি আমায় ভালবাস? একদিনও কি বেসেছিলে?"

ফ্যানী অস্ফুটস্বরে উত্তর করিল—"প্রথম দিন হ'তে। কিন্তু দুরাশা ব'লে অতি গোপনে হৃদয়ের গুপ্ত কন্দরে সাবধানে লুকিয়ে রেখেছিলাম।"

"ফ্যানী ফ্যানী! এত দর আমার নাই। আমায় অত বাড়িও না। এই দেখ আজ আমি ভিখারির অধম, তুমিও আজ আমাপেক্ষা অনেক উচ্চ!"

"মিষ্টার ফষ্টার আপনি কেন যাবেন? কর্ত্তা রাগ ক'রে যদি কিছু ব'লেই থাকেন, সে কি আপনার মনে করা উচিত? তিনি তো আপনাকে কম ভালবাসেন না!"

"ও সম্বন্ধে ফ্যানী! তুমি আমায় কিছুই বলিও না। ফ্যানী! সত্য ক'রে বল দেখি, তুমি এখন এই নিঃস্ব বিতাড়িত ভিখারী চার্লসকে ভালবাস কি না?"

"চার্লস! আমায় বারে বারে আঘাত করো না।"

"তবে তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে চ'লে এস। কোন দূরদেশে গিয়ে আমরা বিবাহিত জীবন সুখে যাপন করব। আমি আজ কপর্দকহীন বটে, কিন্তু জানো তুমি—আমি মুর্খ নই। এসো তবে আর বিলম্ব করে কাজ নেই ফ্যানী!"

ফ্যানী চার্লসের হস্ত হইতে হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া মৃদুস্বরে কহিল —"না।" চমকিয়া চার্লস ফ্যানীর হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল —"যাবে না? আমায় চাও না?"

ফ্যানী দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিল, "না মিষ্টার ফষ্টার। আমার হৃদয় তোমাকেই দিয়েছি; কিন্তু এ তুচ্ছ দেহটা দিতে পার্‌বনা। আমার এ কৃতঘ্নতা আমার বৃদ্ধ শোকজর্জ্জরিত পিতাকে হত্যা ক'রে ফেল্‌বে। আমি তাঁর পৃথিবীর একমাত্র সম্বল।"

"সেইজন্য বুঝি তিনি তোমায় অর্দ্ধমূল্যে যষ্টিবৎসরের বৃদ্ধের হস্তে বিক্রয় কচ্চেন? বুঝেছি, তুমি ঐশ্বর্য্যশালী চার্লসকে ভালবাস্‌তে, দরিদ্র দুর্ভাগ্য চার্লসকে নয়—" এই বলিয়াই চার্লস দ্রুতপদে চলিয়া গেল। ফ্যানী কাতরস্বরে ডাকিল "মিষ্টার ফষ্টার! যেওনা শুনে যাও।" চার্লস ফিরিলনা, দেখিতে দেখিতে রজনীর অভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। আর ফ্যানী সেই জনশূন্য উদ্যানের মধ্যে সেই নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে ঝিল্লীমন্দ্রিত জোনাকীখচিত বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। হা ঈশ্বর! সে কি বাস্তবিকই ঐশ্বর্য্যলোভে আত্মবিক্রয় করিতেছে? সে কি এতই হীন? তাহার প্রেম কি শুধু পিতৃভক্তির তুলাদণ্ডেই প্রত্যাহৃত হয় নাই? তুমি অন্তর্য্যামী! তুমিতো সবই তাহার দেখিতেছ! তাহার কেশ হইতে প্রস্ফুটিত কুসুমের গন্ধ চুরি করিয়া লইয়া বাতাস কখন ঠাণ্ডা হইয়া আসিল; তাহার মুখপানে চাহিয়া নক্ষত্রেরা কোন্ সময় যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

সকালবেলা ফ্যানী যখন চোরের মত নীরবে অ্যালিসের মাথার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তখন অ্যালিস জাগিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই চোখ বুজিল। ফ্যানী মৃদুস্বরে ডাকিল,—"অ্যানিস, কেবল একমাত্র তুমিই আমায় সাহায্য ক'রতে পার।"

অ্যালিস সবেগে বিছানার উপর উঠিয়া অস্বাভাবিক উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিল,—"আমি তোমায় অনেক সাহায্য ক'রেছি, তার ফলে আমার ভাই —আমার এক মাত্র সহোদর—আজ তার নিজের বাড়ী থেকে, কুকুরের মত তাড়িত, লাঞ্ছিত,— আর না—আর না—তুমি যাও, তুমি যাও,"— বলিতে বলিতে সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ফ্যানী কাতর কণ্ঠে বলিল,—“তুমিও আমায় ঘৃণা কর্‌লে? এত ভালবেসেছিলে অ্যালিস, আজকের দিনটাও সেই ভালবাসাটুকু রাখো, তারপর—”

অ্যালিস তাহার মুখের করাবরণ না খুলিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—“একবিন্দুও না,—আর একবিন্দুও না! আমিই আমার প্রাণাধিক ভাইয়ের প্রতি অত্যাচারের মূল। তোমাকে ভালবেসেই আমি আপনার পায়ে আপনি কুড়ূল মেরেছি। তুমি বাড়ীর কর্ত্রীই হও, আর যেই হও, আমার তুমি কেউ নও—কেউ নও তুমি।—যাও, তুমি চলে যাও; এক্ষণি যাও—এক্ষণি যাও!—তুমি না যাও, আমিই যাচ্ছি—” বলিয়া সে ঝড়ের মত উঠিয়া চলিয়া গেল। ফ্যানী বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে আজ কোন্ অপরাধে সকলকার ঘৃণার পাত্রী! তাহার ব্যথা বুঝিবার কেহ নাই। সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিতেছে। কিন্তু কে তাহাকে এমন করিয়া এই সকলকার দুর্ভাগ্যের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল? সে দরিদ্র শিক্ষয়িত্রী, নিজের পদে সেতো সুখেই থাকিতে পারিত? স্বপ্নেও তো সে এ পদ কামনা করে নাই! ফ্যানী স্থির করিল, সে সকলকার এই মর্ম্মভেদী ঘৃণাও বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবে, কিন্তু তথাপি বৃদ্ধ পিতার প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতে পারিবে না।

**৬**

দাসীর সহিত বিবাহপরিচ্ছদে সজ্জিতা ফ্যানী যখন হলে আসিয়া প্রবেশ করিল, তখন হেন্‌রি ফষ্টার একাকী তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ফ্যানী আসিতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ফ্যানীও অজগরদৃষ্টি-মুগ্ধ অজার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিল। গাড়িতে দুজনে পাশাপাশি বসিলেন, কিন্তু কেহই কোন কথা কহিলেন না। গাড়ী আসিয়া গির্জ্জার দ্বারে থামিল। পাদরী নিজে আসিয়া হেন্‌রী ফষ্টারকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। আবশ্যকীয় সাক্ষী ভিন্ন আর কোন লোকই সেখানে উপস্থিত ছিল না। বিবাহ আরম্ভ হয়, পাদরী নিয়মাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে হেন্‌রী ফষ্টার বাধা দিলেন,—“একটু অপেক্ষা করুন, এখনও তো বর—” এমন সময় বাহিরে একটা শব্দ শোনা গেল এবং পর মুহূর্ত্তে সশব্দে দ্বার খুলিয়া একজন লোক তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল, ফ্যানী সঘনে কাঁপিয়া উঠিল। সে রুদ্র মূর্ত্তি চার্লর্স ফষ্টার। চার্লস হস্তস্থিত পিস্তল উঠাইয়া ফ্যানীর ললাট লক্ষ্য করিয়া বিকট হাসি হাসিয়া তাহার আগুনের মত উজ্জ্বল চোখ দুইটা পিতামহের পানে ফিরাইয়া বলিল,—“দাদামশাই! দেখছেন—চার্লস ফষ্টার এমনি করে তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে।” মুহূর্ত্ত মধ্যে হেন্‌রী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—“এইবার বিবাহ আরম্ভ হোক,

চালর্স! তুমি এ কি অসময়োপযোগী অভিনয় ক’রতে এলে! ঐ বাক্সে পোষাক আছে পরো। শীঘ্র তোমার নিজের স্থানে এসে দাঁড়াও।

পিস্তলটা নত হইয়া পড়িল, গভীর বিস্ময়ে দুই পদ হটিয়া গিয়া চার্লস পিতামহের মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। হেনরী এই অবসরে ধীরে ধীরে মুহ্যমান ভ্রাতুষ্পত্রের শিথিল হস্ত হইতে সেই ভীষণ সংহারাস্ত্রটা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে দুই হস্তে বুকে টানিয়া লইয়া আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, —“চার্লি, চার্লি, এস আমার স্নেহের ধন, আমার কাছে,—আমার এই বুকে ফিরে এস! আমার মোহ ভেঙ্গে গেছে। আয় চার্লি, খুব কাছে সরে আয়।”

চার্লসের কম্পিত অবশ মস্তক সহসা প্রতিপালকের বক্ষে লুটাইয়া পড়িল। “দাদা মশাই! এ আত্মসুখোন্মত্ত হৃদয়হীন পাপিষ্ঠকে ক্ষমা কর্ত্তে পার্ব্বেন? উঃ ক্রোধে, মোহে জ্ঞানশূন্য হয়ে কি ভয়ানক কাজই কর্‌তে ব’সেছিলাম। না দাদা, আমারই মোহ ভেঙ্গেছে,—আমি এই চ’লে যাচ্ছি। আপনার কাছে জন্মের মত বিদায়—” বৃদ্ধ সস্নেহে অনুতপ্ত যুবকের হস্ত ধরিয়া অনুতাপরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন —“কোথা যাবি চার্লি? দাদা আমার? আমার সর্ব্বস্ব ধন! তুই কোথা যাবি? বৃদ্ধবয়সে লোকে জ্ঞানহীন হয়, তাই হঠাৎ এক দিনের জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলাম মাত্র! সময় বয়ে যাচ্ছে,—এস তুমি প্রিয় বৎসে! আমার প্রাণাধিক চার্লসের পাশে বসিয়ে তোমার আজ ভাল ক’রে দেখি এস। উন্মাদ বৃদ্ধকে ক্ষমা করিস্ দিদি!—কিছু মনে করিস্‌নে। শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়! আপনার কার্য্য এইবার আরম্ভ হৌক।”

# গৃহ

## মুক্তা, সুধা, অমৃত, মৎস্যজীবী ও নন্দ

স্থান—সমুদ্রতীর; কাল—অপরাহ্ন।

দৃশ্য—মৎস্যজীবীর সমুদ্রতীরস্থ কুটীরের অভ্যন্তর;

মুক্ত দ্বারপথে সূর্য্যোদয়ের অপূর্ব্ব শোভা দেখা যাইতেছে, সমুদ্রের নীল জলে সেই সূর্য্যাস্ত-রঞ্জিত আকাশের ছায়া স্বপ্নপুরীর মত মনোহর দেখাইতেছিল, গৃহের মধ্যে এক পার্শ্বে মলিন শয্যা বিছান রহিয়াছে এবং তাহার অপর প্রান্তে দ্বারের দিকে ফিরিয়া মুক্তা চরকা কাটিতেছিল। হঠাৎ স্বপ্নাবিষ্টের মত উঠিয়া সে একেবার দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল এবং উজ্জ্বল আকাশের দিকে চাহিয়া সমুদ্রের বক্ষে দৃষ্টি স্থির করিল।

মুক্তা। (উৎকর্ণ হইয়া) এখনও—এখনও সে—সে ডাক্ ভুল্‌তে পারিনি, ঐ আবার ডাক্‌ছে। “ফিরে এসো” বলে দুই বাহু তুলে ডাক্‌ছে। নিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার চরকার নিকট বসিল। তার পর একটুখানি বিষন্ন হাসি হাসিয়া কাজ করিতে করিতে গাহিতে লাগিল—

সিন্ধুর তলে, রয়েছে অতলে আমার আপন জন,
কেমনে হেথায় রহিব, সেথা যে রয়েছে হৃদয় মন।
নাচে তরঙ্গ তালে তালে
ডাকে আয়, ফিরে আয় ব’লে
সুখস্মৃতিময় গৃহেতে সে যেরে করিছে আকর্ষণ,
ঐ শুনা যায়, গর্জ্জন গানে তাহাদেরি আবাহন।

সুধা ম্লান মুখে প্রবেশ করিল। মুক্তার নিকটে আসিয়া সে কপালে হাত দিয়া কাঁদো কাঁদো হইয়া কহিল, “মা! আমার বড় মাথা ধরেছে, মা আমায় কোলে নে না, মা।”

মুক্তা চরকা সরাইয়া রাখিয়া সুধাকে কোলে লইয়া চুম্বন করিয়া কহিল, “রৌদ্রে বুঝি খেলা করছিলে মা আমার, কাছে এস।”

সুধা। তোমার কোলে মাথা রেখে একটু শুই, তা'হলেই সব ভাল হয়ে যাবে, (নীরবে শুইয়া থাকিয়া কিছুক্ষণ পরে) যদি তুমি একটী গল্প বল মা, তা হ'লে এখনি আমার মাথা ধরা ভাল হয়ে যায়।

মুক্তা। (হাসিয়া) মাথা ধরার ওষুধ বুঝি এই?

সুধা। (মার হাত ধরিয়া কাজ বন্ধ করিয়া দিল) সত্যি ভাল হয়ে যাবে মা, সত্যি বল্‌ছি। তুমি ত সেই দুপুর বেলা থেকে সূতো কাটছ—এখন থাক্।

মুক্তা কাজ বন্ধ করিয়া আবার কন্যাকে চুম্বন করিল। সুধা দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। মুক্তা কহিল, "কিসের গল্প বল্‌বো সুধা?"

সুধা। জল-কন্যার গল্প বল।

মুক্তা। (চমকিয়া উঠিয়া) ঐ কথা, ঐ গল্প কতবার বল্‌বো সুধা? না না—

সুধা (মাতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া) অন্য কোন গল্প তো বল না, ওটিই যে জান, বড়ই কিন্তু দুঃখের গল্প, শুন্‌তে গেলে কান্না পায়। আচ্ছা মা! ওর শেষকালটাতে সুখ হবে?

মুক্তা। (স্বপ্নবিষ্টের মত) শেষ, শেষতো নেই—

সুধা। (হাসিয়া) কখনও তো শেষ হবে! আচ্ছা এখন তুমি আরম্ভ কর।

মুক্তা। জলের নীচে জল-কন্যাদের দেশ আছে। এক সময়ে সেই জল-রাজ্যে একটি মেয়ে— খুব সুখী, খুব চঞ্চল একটা মেয়ে, তার সঙ্গীদের সঙ্গে তার নিজের প্রবাল নির্ম্মিত গৃহ হ'তে বাহির হয়ে এসেছিল। এই সমুদ্রের জলেরউপর খেলা করতে তার এত ভাল লেগেছিল যে, সে নিত্যই নির্জ্জন সমুদ্রকূলে, পর্ব্বতের উপরে ও ঢেউয়ের মুখে খেলা করবার জন্য ভেসে উঠতে লাগলো।"

সুধা। (বাধা দিয়া) মেয়েটি কার মত মা? তোমার মত সুন্দর? ওমনি সমুদ্র-জলের মত চোখ? মেঘের মত চুল, আর বিদ্যুতের মত রং? তারপর—

মুক্তা। (স্বপ্নাবিষ্টের মত) হ্যাঁ তারপর—তারপর এমনি ক'রে কতদিন কেটে গেল। কি সুখের দিন সে সব! হাতে বীণ, গলায় অম্লান ফুলের শতনর মালা, ঢেউয়ের উপর ঢেউয়ের তালে পা ফেলে হাত ধরাধরি করে ভাই বোনের আনন্দ-

নৃত্য; কখনও বা জ্যোৎস্নারাত্রে তরঙ্গ-দোলায় শুয়ে দোল খাওয়া; ওঃ কি সে সুখের প্রস্রবণ—(চিন্তা)

সুধা। তারপর?

মুক্তা। তারপর সহসা একদিন সেই হতভাগিনী জলকন্যার অদৃষ্ট ভাঙ্গিল। সমুদ্রতীরে এক পর্ব্বতের উপরে আনন্দনৃত্যের অবসরে তার গায়ের প্রবালের ওড়না কেমন ক'রে যে খ'সে প'ড়েছিল, তা আর সে কোথাও খুঁজে পেলে না। সমস্ত রাত সকলে মিলে পাতি পাতি খুঁজেছিল, কিন্তু কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। তখন সকলে মিলে তাকে ঘিরে শোক করতে লাগল, কেননা সেই প্রবালের ওড়নার সঙ্গে তার জলের নীচে যাবার শক্তিও ফুরিয়ে গেছে।

সুধা। (সাগ্রহে মার মুখের দিকে চাহিল) তার পর, সেই জলকন্যার কি হোল?

মুক্তা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) সূর্য্যোদয় হ'তেই সমস্ত জলবাসী সঙ্গীরা সমুদ্রে ডুবে গেল। কেবল সেই অভাগিনী জলকন্যা জলের ধারে বসে ডুবে মরবার কথা ভাবছে, এমন সময়— (নীরব।

সুধা। (অসহিষ্ণু ভাবে মাকে ঠেলিয়া) এমন সময় কি মা?

মুক্তা। (সচকিতে) এমন সময় একজন ধীবর এসে তাকে আশ্রয় দিলেন, তিনি খুব দয়ালু, তাই তাকে তাঁর স্ত্রী করলেন।

সুধা (সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল) সে ধীবরও বুজি বাবার মত? আর সেই জলকন্যার একটি মেয়ে ছিল, না? আর একটী ছেলে?

মুক্তা। (মস্তক আন্দোলন করিয়া) ছিল, ছিল বই কি, না হ'লে সে কি করে বাঁচল!

সুধা। (হাসিয়া মার দিকে দুই হাত বাড়াইল) তা হলে সে খুব সুখী হয়েছিল তো?

মুক্তা। (সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া উঠিয়া অধীর ভাবে দ্বারের নিকট গিয়া আকুল নেত্রে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখতে চঞ্চল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল) তোমরা বুঝতে পারবে না, সুধা, কিছুতেই তার মনের ভাব তোমরা বুঝতে পারবে না, এখনও সে তার সেই ওড়না খুঁজে বেড়াচ্ছে, এখনও নিজের দেশে ফিরে যাবার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে তার বুক ফেটে কামনা ছুটে বেরুতে চাচ্ছে, সেকি

তার সে সুখের জীবন ভূলতে পেরেছে, না যারা তার সত্যকার আপন, তারাই তাকে বিস্মৃত হয়েছে?

সুধা। (উৎসুক ভাবে) কিন্তু সে যদি ফিরে যায়, তার ছেলেরা যে কাঁদবে।

মুক্তা। (কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া) চুপ কর্ রাক্ষসি! চুপ কর্। (সুধার ক্রন্দনোদ্যম; মুক্তা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কন্যার নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ও তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া) সুধা, মা আমার, মাণিক আমার! থাম্।

সুধা। (মাতাকে জড়াইয়া) ভাগ্যে গল্পটা সত্যি নয় মা, আমার এমনি ভয় হচ্ছিল!

বস্ত্রের মধ্যে কোন বস্তু গোপন করিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে অমৃত প্রবেশ করিল।

মুক্তা। (স্বপ্নাভিভূতভাবে) আজ পূর্ণিমার রাত্রি, আজ তারা জ্যোৎস্নাতরঙ্গের উপরে গান কর্তে আসবে। কি হাসি, কি আনন্দ, কত উৎসাহ—উঃ।

অমৃত। মা তোমার জন্যে কি এনেছি দেখ। বল্ দেখি কি? সুধা! তুই কখনও বলতে পারবিনি; এরকম জিনিষ তুই কখনো দেখিস্ নি।

সুধা—কড়ি, ঝিনুক, ইত্যাদি দু-চারিটা পরিচিত বস্তুর নাম করিল, কিন্তু অমৃত লুকান বস্তু বাহির করিল না। কেবল হাসিতে লাগিল।

সুধা। (মুখ ভার করিয়া) ভারি জিনিষ! দেখতে চাই না, যাও।

অমৃত। দুটো পাহাড়ের মাঝখানে একটা গর্ত্তে এইটা ছিল, আমি দেখতে পেয়ে এনেছি, মা! তুমি এই নাও, সুন্দর একখানি ওড়না, প্রবালের ওড়না!

মুক্তা। (চমকিয়া উঠিয়া সাগ্রহে) আঁ প্রবালের ওড়না! দাও আমায় দাও (হস্ত প্রসারণ)।

সুধা ছুটিয়া গিয়া অমৃতের প্রসারিত হাত ধরিতে গেল ও বলিয়া উঠিল, "দাদা, দাদা! দিওনা, ছিঁড়ে ফেল, এখনই গল্প সত্যি হয়ে যাবে।"

অমৃত। (হাত সরাইয়া লইয়া মাতার হস্তে ওড়না প্রদান করিয়া) মেয়েগুলো এমনি হিংসুকে হয়। আমাদের রাণীর মত মাকে কত সুন্দর দেখাবে তা ভাবলে না,

বল্‌লে ছিঁড়ে ফেল।

ওড়না লইয়া মুক্তা আহ্লাদে অঙ্গে পরিয়া বলিয়া ফেলিল, "এই আমার ওড়না, আমার হারান ধন।"

অমৃত। (সবিস্ময়ে) তোমার!

মুক্তা। (তাহার বাক্যে কাণ না দিয়া) আবার এখন আমি আমার নিজের ঘরে ফিরে যেতে পারব, ঐ সমুদ্রে; ওঃ! ঐ সমুদ্রের অতল জলে ফিরে যাব।

সুধা। (কাঁদিয়া উঠিয়া) মা, মা!

মুক্তা। (বাহিরের দিকে চাহিয়া) ঐ সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ওঃ কি আনন্দ! কি স্বাধীনতা! তারা এখনও আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। ঐ যে তারা ডাক্‌ছে মুক্তা, মুক্তা (উচ্চ কণ্ঠে) যাই (গমনোদ্যত)।

সুধা ছুটিয়া আসিয়া তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল, আকুল কণ্ঠে ডাকিল, "মা মা, যেও না মা।"

মুক্তা। (তাহাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া না চাহিয়া) স্বপ্ন পুর্ণ হয়েছে, যেতে হবে, ওঃ যেতেই হবে। আমার ঘরে, আমার দেশে ফিরে যাব, আমায় তাতে বাধা দিবি—কে তোরা? (সবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল)।

অমৃত। ব্যাপার কি সুধা! মা ওরকম সব কথা ব'লে কোথা গেল বল্‌ দেখি, কি হ'ল কিছুই বুঝতে পারলেম না!

সুধা। (কাঁদিয়া) মা চ'লে গেছে, জন্মের মত চলে গেছে, দাদা কেন তুমি ওড়না এনে দিলে?

অমৃত কিছু বুঝিতে পারিল না দেখিয়া সে তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, মা সেই গল্পের জলকন্যা। এই কুটীরে সে ঘৃণার চক্ষেই বাস করছিল, আজ সে আমাদের ছেড়ে নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছে, আর আসবে না।

অমৃত। (তীব্র স্বরে) ঈস্‌ চ'লে যাবেন, গেলেই অমনি হ'ল; বাবা যেতে দেবেন কেন? হ'লই বা ক্ষুদ্রকুটীর, এই ক্ষুদ্র কুটীরইতো তাঁর বাড়ী। বাবা তাঁকে ধ'রে আনবেন।

সুধা। (আর্ত্তস্বরে) না দাদা! তার এ বাড়ী নয়, বিশাল সমুদ্রের নীচে তার প্রবালের ঘর আছে। হীরার প্রদীপে সেখানে আলো জ্বলে, মুক্তার ঝালরে চাঁদোয়া খাটায়, সোনার পালঙ্কে সে শুয়ে থাকে, সে আর আস্‌বে না।

অমৃত ডাকিল—বাবা, ও বাবা।

(এমন সময় ভিজা জাল কাঁধে লইয়া ধীবর নন্দ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল)

নন্দ। মুক্তা! একটা কাঠের গুঁড়ি সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছিল, ধ’রে রেখেছি। কুড়ুল খানা নিয়ে চল তো কেটে আনিগে। (মুক্তাকে না দেখিতে পাইয়া) তোমাদের মা কোথা গেছে?

সুধা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) ফিরে গেছে।

নন্দ সবিস্ময়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিল।

অমৃত। আমি কাঁকড়া ধরতে গিয়ে পাহাড়ের গর্ত্ত থেকে একখানা প্রবালের ওড়না পেয়েছিলেম, সেইটে—

নন্দ। এতদিন পরে! হা নির্ব্বোধ! সেটা কি হ’ল?

অমৃত। মাকে দিয়েছি। মা সেইটা প’রে—

নন্দ। জাল ফেলিয়া ছুটিয়া বাহিরে গেল, আবার ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কতক্ষণ?”

অমৃত। এখনি সমুদ্রের দিকে গিয়েছেন।

নন্দ মুক্তা মুক্তা করিয়া উন্মাদের ন্যায় সমুদ্রকূলে ছুটিল।

সুধা। দেরী হয়ে গেছে। সে এতক্ষণ সমুদ্রের নীচে চলে গেছে। আর সে ফিরে আসবে না।

নন্দ। (পুনঃ প্রবেশ করিয়া) কোথাও নাই, সে চ’লে গেছে। সে ফাঁকি দিয়ে চ’লে গেছে। (দুই হাতে বুক চাপিয়া শয্যার উপর পড়িল) আমি একলা এতদিন ফাঁকি দিয়ে আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে চুরি করে এনে রেখেছিলাম, আজ সে তার শোধ নিলে, আমার—আমার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দিয়ে চ’লে গেল।

সুধা। (পিতার পিঠের উপর পড়িয়া) বাবা বাবা!

নন্দ। কত জন্মের তপস্যার ফলে সে দিন পাহাড়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। ঘুম ভেঙ্গে দেখি স্বপ্নকন্যার মত সুন্দরী সব জলকন্যার জলক্রীড়া ছেড়ে জ্যোৎস্নালোকে নৃত্য করছে। সে দিনও এমনি পূর্ণিমার রাত; এমনি ঝকঝকে চাদ দিনের মত আলো ক'রে রেখেছিল। সমুদ্রই আকাশের মত স্থির হয়ে প'ড়ে তাদেরই সেই স্বর্গের গান শুনছিল। আমার মাথা ঘুরে গেল, পা টিপে টিপে পেছন থেকে গিয়ে তার ওড়নাখানা টেনে নিলেম। সে এমনি আনন্দে মত্ত, জান্‌তেও পার্‌লে না। তারপর (তীব্র আনন্দের সহিত উঠিয়া বসিয়া) কি সুখ! কি গৌরব! সে স্বর্গের দেবী ধীবরের কুটীরে অধিষ্ঠিতা হ'ল। সে আমার, (পুত্র কন্যার দিকে চাহিয়া) আমাদের হয়ে গেল। সমুদ্র কি এত বড় যে, সে সেই জ্বলন্ত স্মৃতিকে ডুবিয়ে দিতে পারবে? না, সে যে আমাদের, সমুদ্রের তাকে চুরি কর্ব্বার তো আর কোনই অধিকার নেই।

সুধা। (চোখ মুছিতে মুছিতে) সে নিজে যে আমাদের ছেড়ে গেছে।

নন্দ। (শুষ্কস্বরে) সে যখন যন্ত্রণায় মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে কাতর কণ্ঠে কাঁদত, আমি আমার কাণ দুটা রুদ্ধ ক'রে রাখতেম। সে যখন তার ঘরে ফিরে যাবার কথা বলত, আমি ভাবতেম কতদিনে আমার এই কুটীরে তার প্রতিষ্ঠা করতে পার্ব্বো। তারপর ক্রমে ক্রমে সে এই কুটীরকেই তার ঘর ক'রে নিয়েছিল।

সুধা। (বাধা দিয়া) না বাবা, সমুদ্রের জন্যই সে তার ঘর নিতে পারেনি, সমুদ্র তাকে সর্ব্বদা আয় আয় বলে ডাকত, দুষ্ট সমুদ্র!

নন্দ। সে তার মনের কল্পনা, কিন্তু কি তার হৃদয়। সে এত কঠোর! যতটুকু তাকে আমরা জোর ক'রে ধ'রে রেখেছিলেম, ঠিক ততটুকু রইল, তার চেয়ে আর একটুতো বেশী নয়; (সুধা ও অমৃত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল) সে আমাদের জন্য কত ক'রেছে, আমাদের স্নেহ, যতন, ভালবাসা দেখিয়েছে। কিন্তু মনে মনে সমস্ত দিনই কেবল ভেবেছে কতক্ষণে আমাদের ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবে।

সুধা। আবার হয়তো—

নন্দ। (সাগ্রহে) হয়তো কি?

সুধা। ফিরে আস্‌তে পারে—

নন্দ। (কম্পিত পদে উঠিয়া দাঁড়াইল) না, পাষাণী সে, সেতো এ পৃথিবীর নয়। মায়া, দয়া, প্রেম, স্নেহ-এ শুধু যে এই পৃথিবীর মাতৃবক্ষের দান, এর ওপোরে নেই, নীচেও না। কিসের বন্ধনে সে ফিরে আসবে সুধা? সে আর আসবে না, রাত্রি হয়ে পড়েছে, শুতে যাও। দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিও।

সুধা। (কাতর হইয়া) মা, যে বাহিরে আছে। যদি দোর বন্ধ দেখে ফিরে যায়, খুলে দাও। (নন্দ শিথিল হস্তে দ্বার উদ্ঘাটন করিল) সুধা দ্বারের নিকটে গিয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল, “মা, মা, মা গো!”

অমৃত তাহার অনুসরণ করিল, “ফিরে এস, ফিরে এস মা, ওমা! আমাদের কাছে ফিরে এস। কই কেউ নেই।”

নন্দ। (চোখে করাবরণ করিয়া) তোরা কি আমায় স্থির হ’তে দিবিনে? কাকে ডাক্‌ছিস্? সে তোদের মা নয়! যা শুতে যা, সে তোদের ভালবাসত? মিথ্যে কথা, কখনও ভালবাসত না, ভাল ভাল করেছিল। ভালবাসলে কি সে এমন ক’রে তোদের ফেলে চ’লে যেতে পারত? না।

সুধা ও অমৃত ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় গিয়া শুইল। নন্দ বাহিরে চলিয়া গেল। দোর খোলাই রহিল।

সুধা। (স্বপ্নে) কেমন ক’রে তোমায় ছেড়ে থাকব মা! আমায় ব’লে গেলিনে, আদর করলিনে, চ’লে গেলি।

সমুদ্রে চাঁদের আলো পড়িয়া উজ্জ্বল রূপার পাতের মত দেখাইতেছিল। জলের মধ্য হইতে মুক্তা উত্থিত হইল। প্রবালের ওড়না তাহার কাঁধের উপরে একখানি সূক্ষ্ম স্বর্ণ জালের মত পড়িয়াছিল, কপালের চুলে উপর হইতে মুক্তার লহর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বর্ষার জলধৌত লতার মত সৌন্দর্য্য যেন আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কুটীরের অভিমুখে যাইতে যাইতে মুক্তা মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল, “আমার পা যেন ভারি হয়ে উঠেছে, গলার সুর আর গান গাইবার উপযুক্ত নেই, এ আমার কি হ’ল! একি? তাদের সঙ্গ ছেড়ে এ কোথায় আবার চ’লে এলেম! (চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে) এখানে! কে আমায় এখানে টেনে আনলে! (দ্বারের নিকটে গিয়া) আমার ছেলেরা? (আবদ্ধভাবে গৃহে প্রবেশ করিল ও অনিচ্ছুকপদে অগ্রসর হইয়া শয্যার নিকটে দাঁড়াইল) সুধা নিদ্রার মধ্যেও কাঁপিয়া উঠিয়া ডাকিল, “মা, ওমা ফিরে আয় মা, ফিরে আয়!”

মুক্তা। (মুহূর্ত্তে নত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া) “আয় আমার সঙ্গে চল্ তবে।”

সুধা। ঘুমাইয়া স্বপ্ন জড়িত ভাবে কহিল, “না তুমি এস, উঃ বড় শীত, দোর বন্ধ করে আমার কাছে শোও তুমি।”

মুক্তা। মন্ত্রমুগ্ধ ভাবে দ্বার রুদ্ধ করিতে গিয়া হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠিল।

মুক্তা। না না, আমি ফিরে যাব।

নন্দ। ধীরপদে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল, “মুক্তা!” মুক্তা সহসা চমকিয়া সরিয়া গেল। ওড়নাখানি সে দুই হাতে চাপিয়া ধরিল।

নন্দ (প্রশান্তভাবে) ভয় নেই, তোমায় পারলেও আজ আর ধ’রে রাখব না।

মুক্তা। (বিস্মিত হইয়া তাহার মুখে তাহার দুই চোখ স্থির করিল) ধ’রে রাখবে না।

নন্দ। না, যদি তুমি আমাদের ছেড়ে গিয়েই সুখী হও, যাও, কেন বাধা দেব?

মুক্তা। (স্বপ্নবিষ্টভাবে) ওই উত্তাল তরঙ্গমালার উন্মাদ তাণ্ডব শুধু তোমরা দেখতে পাও, গান নাচ ওর নীচে, ওর নীচে কি সুন্দর, কি সুখের রাজ্য আছে। সেখানে আমার গৃহ, তুমি তাদের গান শোননি ত! কি আশ্চর্য্য সে গান, তার সুরে জগতের সমুদয় ফুল ফুটে ওঠে, পাখী গায়, শিশু হাসে!

নন্দ। না, আমি তোমার গান শুনেছি। কিন্তু গানের চেয়ে কি মানুষ সত্য নয়? তাই তুমি আসবার পর থেকে—(নন্দ চুপ করিল)

মুক্তা। (উৎসুকে) পর থেকে—

নন্দ। তোমার অধিষ্ঠানই আমার সঙ্গীত হয়ে গিয়েছিল (তাহার হাত ধরিল)

মুক্তা। আমার কণ্ঠ তার চিরাভ্যস্ত গান ভুলে গেছে। কিন্তু হয়ত দুদিন পরে আবার মনে পড়বে। তখন আর সব ভুলে যাব।

(তাহার মুখের দিকে শিহরিয়া চাহিয়া) পার্‌বে মুক্তা?”

মুক্তা মুখ ফিরাইয়া লইল, তারপর ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল,—“ঐ শোন, মুক্তা! মুক্তা! ঐ তারা আমায় ডাক্‌ছে! আমি যাই।”

নন্দ। (তীব্রভাবে ফিরিয়া) কেন তুমি ফিরে এলে?

মুক্তা। (চঞ্চল হইয়া উঠিয়া) কেন ফিরে এলেম? আমি আসতে চাইনি, কে আমায় টেনে আন্‌লে? আমার ছেলেরা——

নন্দ। (হতাশার্ত্ত কণ্ঠে বাধা দিয়া) ছেলেরা! তোমার ছেলেরা! এই আমার উপযুক্ত! এই শেষ হ'ক, তবে যাও।

মুক্তা। যাই! আমায় দোষ দিও না; ভেবে দেখ দেখি তখনকার কথা, যখন তুমি আমায় ছলনা ক'রে আমার দুঃখে সহানুভূতি দেখিয়েছিলে। ছলনা ক'রে ওড়না খোঁজার ভান ক'রে আমায় বিশ্বাস করিয়েছিলে।

নন্দ। (সচকিতে) আমি তোমার ওড়না লুকিয়ে রেখেছি, এ সন্দেহ তোমার মনে কখনও উঠেছিল?

মুক্তা। (ধীরকণ্ঠে) কখনও না। তুমি নিজের সম্মান নষ্ট ক'রে এমন গর্হিত কাজ কর্‌বে এ সন্দেহ আমি মনে স্থানও দিইনি।

নন্দ। (নিম্নস্বরে) আমার সম্মানের উপরেও তোমার স্থান।

মুক্তা। আমার আত্মীয়েরা যদি জানতে পারে তুমি আমার ওড়না লুকিয়ে রেখেছিলে, তাহলে তারা তোমায় হত্যা কর্‌বে।

নন্দ। (গম্ভীর স্বরে) তোমায় ছেড়ে আমার জীবন যে ঈপ্সিত নয় মুক্তা!

মুক্তা। (একটু সরিয়া গিয়া) আমার ঘরে আমি যেতে চাই; আপনার লোকেদের কাছে কে না যেতে চায়? আমায় জোর ক'রে ধ'রে রেখেছিলে, মন আমার সেইখানে পড়েছিল; আবার এ কি। হাত ছাড়, যেতে দাও।

নন্দ। (তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া) যাও।

মুক্তা বাহিরে গেল, গৃহের পানে চাহিয়া মূক্তকণ্ঠে বলিতে গেল, "আমি জন্মের মত তোমাদের ছেড়ে চল্লেম।" কিন্তু, মুখ দিয়া কান কথা বাহির হইল না। তারপর এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সহসা সে ফিরিল। তার পর উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি যেতে পারছিনে, না না, কিছুতেই যে যেতে পারছিনে, আমার স্থান সেখানে খালি নেই, কিন্তু এখানে শূন্য হয়ে যাবে। তারা আমায় ভূলে গেছে। এরা আবার তেমনি ক'রেই ডাক্‌ছে। তারা সবাই, সেই রকমি আছে, কিন্তু আমিত কই সে রকম নেই।"

নন্দ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, কম্পিত কণ্ঠে কহিল, “গেলে না মুক্তা! যাও যদি—আর দেরী করে কাজ নাই। আমি মনকে বেঁধে রেখেছি। অকস্মাৎ আমার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ না করে এই জাগ্রতের মধ্যে বিদায় দাও! সে আঘাত বড় কঠিন, বড় নিষ্ঠুর হবে!”

মুক্তা। (নিকটে আসিয়া) না যাব না, কোথা যাব? এই যে আমার ঘর—আমি যাব না।

নন্দ। (সন্দিগ্ধ ভাবে) সে আমি সহ্য কর্ত্তে পার্‌ব না; উঃ কিছুতে না, গুপ্তহত্যা হওয়ার চেয়ে আত্মহত্যা করা ভাল। যাবে যদি এখনি তবে যাও।

মুক্তা। (ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে হইতে) বিশ্বাস করছনা, তবে এই নাও প্রবালের ওড়না। স্বেচ্ছায় তোমায় আমি আমার যাবার শক্তি আজ জন্মের মত দান করলেম! এতক্ষণে আমি বুঝতে পারছি কিসের আকর্ষণে আমায় এখানে টেনে এনেছে! শুধু সন্তানের স্নেহ নয়, তা যদি হ’ত তা হ’লে সেখানে আমার মা আছেন, সে আকর্ষণ কিসে রুদ্ধ হ’ত?

নন্দ সহসা দুই হাতে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া কহিল, “কি সে মুক্তা? সে কি তবে?”

মুক্তা জ্যোৎস্নাজালের মধ্যে তাহার প্রবাল ওড়না খানিকে দলিত ও নিক্ষেপ করিয়া স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিল, “তুমি, তুমিই টেনে এনেছ, তোমার প্রেমই আমায় এখানে এনেছিল, আজ আবার সেইই আমায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে, এত দিন ভেবেছি এ তোমার ঘর, আজ আর এ তোমার ঘর নয়, আমাদের।

## সমাপ্ত

## 🔸 Contributor 🔸

🤖 This ebook is auto generated using python from WikiSource (উইকিসংকলন) by bongboi. Thanks to the volunteers over wikisource:

- Salil Kumar Mukherjee
- Nettime Sujata
- Bodhisattwa
- Tahmid

🙂 Wikipedia has it's own epub generation system but somehow due to weird Styling and Font embedding those EPUBs invariably slows down the device in which you're reading. And Fonts get broken, some group members on t.me/bongboi_req reported this, so decided to build those concisely via Python.

✌️ Utmost care have been taken but due to non-survilance some ebook parts may be broken. If you find such please improve and submit or report to @bongboi_req. So that those can be improved in future

## 🔸 Disclaimer 🔸

⚠️

⚔️ Tele Boi does not own any content of this book. All the copyright is of respective authors/publishers of the books. @bongboi compiled this for Non-profit, educational and personal use, in favour of fair use.

🌏 The content of the book is publically available in the WikiSource.

🔥 Do Not redistribute in a commercial way.

✅ Please buy the hardcopy of the books to support your favourite authors and/or publishers.

---

## 🔸 সমাপ্তি 🔸

পড়ে ভাল লাগলে বই কিনে রাখুন।

🖤 করোনার প্রকোপের সময় বানানো বইগুলি। সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থ রাখুন।

🔊 Bengali Language have very few EPUBs created. @bongboi started creating this as a hobby project and made more than 2000 EPUBs at this stage.

🌟 Be a volunteer @bongboi or at WikiSource so that more ebooks become available to the public at large.

**Help People Help Yourself** ❤️

আরও বই ⏬

টেলি বই

MOBI